সুর নৃত্যের উর্বশী



সুর নৃত্যের উর্বশী

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

মণ্ডল বুক হাউস
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৫৬

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু

ব্লক নির্মাতা
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ও আলোকচিত্র মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীঅজিত কুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯।

ভূমিকা

পাশ্চাত্যের একযুগের সর্বোত্তমা অপেরা-গায়িকা মাদ্‌মোয়াজেল এমা কালভের নামের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই স্বামীজীর জীবনী এবং রচনাবলী পাঠ করে। কালভে তাঁর আত্মজীবনীতে স্বামীজীর ছবি এঁকেছেন গভীর রেখায়—সে অংশ উদ্ধৃত আছে স্বামীজীর জীবনীতে। স্বতঃই আত্মজীবনীটি পড়বার আগ্রহ বোধ করি এবং সেটি সংগ্রহ করে পড়েও ফেলি। বইটি গভীর আনন্দ দেয়। এর মধ্যে এমন সব ঘটনা বর্ণিত আছে, যাতে সেরা ছোট গল্প ও নাটকের স্বাদ মেলে। সেই সঙ্গে আছে একজন শিল্পীর ক্রম-উত্থানের কাহিনী, তাঁর স্বপ্ন, সংগ্রাম, বিপর্যয়, ও জয়ের ইতিহাস। অনন্ত আকাঙ্ক্ষা—কিভাবে অনন্তের আকাঙ্ক্ষায় পৌঁছয়, তার গভীর বার্তাও সেখানে পেয়েছি। তখন মনে হল, বাঙালী পাঠকের জন্য এ-কাহিনী লেখা উচিত। পাঠক এখানে পেয়ে যাবেন এক প্রতিনিধি-শিল্পীকে, মথিত যাঁর জীবন, জিজ্ঞাসায় কাতর, উদ্‌ঘাটনের দারুণ যন্ত্রণায় ছিন্ন-ভিন্ন, এবং প্রাপ্তির অসহ্য পুলকে আত্মহারা। শিল্পীর জীবন অনেক সময়ই শ্রেষ্ঠ শিল্পের উপাদান।

এ গ্রন্থ লেখার জন্য মাদাম কালভের আত্মজীবনী ছাড়া আরও যেসব গ্রন্থ বা প্রবন্ধের সাহায্য নিয়েছি, গ্রন্থপঞ্জীতে তাদের উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে আমি বিশেষভাবে ফ্রান্সের রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টারের স্বামী বিদ্যাত্মানন্দের নানা মূল্যবান প্রবন্ধের উল্লেখ করতে চাই, যিনি অধিকন্তু কালভের সমাধিস্থানের ছবি আমাকে পাঠিয়েছেন। এই সূত্রে স্বামী বলরামানন্দ, স্বামী [illegible], স্বামী যোগেশানন্দের কাছে

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সাহায্যের জন্য। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ, নিউইয়র্ক ওয়ার্লড্ পত্রিকার চিত্রের জন্য।

বেশ কয়েক বছর আগে যখন বইটি লেখার পরিকল্পনা করি তখন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (এখন লোকান্তরিত) আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। দু' একটি প্রয়োজনীয় বইও দিয়েছিলেন। অল্পদিন আগে ফেলে-রাখা লেখাটি শেষ করার সময়ে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্যের পরামর্শে। দেশ পত্রিকার সুখ্যাত সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষের ইচ্ছাতেই লেখাটি শেষ হতে পেরেছে।

আরও যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ তাঁদের মধ্যে আছেন, সর্বশ্রী সুনীলবিহারী ঘোষ, মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, রবি বসু, বিমল ঘোষ, ডঃ রাখহরি চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার অধিকারী এবং শ্যামলকুমার ভট্টাচার্য।

এই গ্রন্থের অঙ্গসজ্জায় যদি সৌন্দর্য থাকে তাহলে তার কৃতিত্ব শিল্পী-বন্ধু শ্রীগণেশ বসু এবং প্রকাশক-বন্ধু শ্রীসুনীল মণ্ডলের।

শংকরীপ্রসাদ বসু

উৎসর্গ

শ্রীমতী মায়া বসুকে

এ লেখা যিনি প্রথম পড়েছেন,

এবং···সমালোচনা করেছেন।

আমাদের প্রকাশিত
গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ :

বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ
কবি ভারতচন্দ্র
ক্রিকেট অমনিবাস (প্রথম, দ্বিতীয় খণ্ড)



সুরের অপ্সরা কলকাতায়

শুরু কবা যাক কলকাতা থেকেই।

১৯১০ সালের শেষভাগ। তখনো কলকাতা ভারতের রাজধানী। বৃটিশ-সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী কলকাতা—নভেম্বর-ডিসেম্বরে ঘোড়-দৌড়ে, বলনাচের ঘুর্ণিপাকে, শ্যাম্পেন-শেরীর পানোৎসবে মাতোয়ারা। অনেকে দূরে ফেলে-আসা স্বদেশের স্ফূর্তির স্বপ্ন চোখে মাখিয়ে উদ্দাম উল্লাসে দেহ-মনের তৃষ্ণা মিটিয়ে নিতে ব্যস্ত সাহেবগণ। তাঁদের সামাজিক অনুষ্ঠান, রঙ্গরস, বিলাস-ব্যসনের সংবাদ ফলাও করে ছাপা হয় নীলরক্ত ইংরাজদের মুখপত্র 'ইংলিশম্যানে।'

এহেন ইংলিশম্যান ২৩ নভেম্বর, ১৯১০, নিম্নের শিরোনামা নিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ল :

কলকাতায় মাদাম কালভে

সঙ্গীত-রাজ্ঞী কেন ভারতে এসেছেন

গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে সাক্ষাৎকার

প্রকাশিত সংবাদের মধ্যে এই কথাগুলিও ছিল :

"কলকাতার নীরস ক্লান্তিকর জীবনের ঘুরপাকের মধ্যে, যেখানে কেবল শীত-ঋতুর আমোদ-প্রমোদে কিছু একঘেয়েমি কাটে, সেখানে সঙ্গীত-কুল-রাণীর আগমন সাধারণ ঘটনা নয়। স্বয়ং মাদাম কালভে কলকাতায় দেখা দিচ্ছেন—এই সংবাদ তীব্র প্রত্যাশায় উন্মুখ করেছে সকলকে। কলকাতায় তিনি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে আছেন। গতকাল অপরাহ্নে ইংলিশম্যানের প্রতিনিধি গায়িকা-প্রধানার মুখোমুখি হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।"

সংবাদপত্রের প্রতিনিধি পৃথিবীর সর্বোত্তমা গায়িকার ব্যবহারের সৌন্দর্যে ও সরলতায় মোহিত। তিনি জেনেছিলেন, মাদাম পুরো গানের প্রোগ্রাম নিয়ে কলকাতা বা ভারতে আসেন নি, এসেছেন বিশ্রাম করতে আর ভারতকে জানতে—তার ধর্ম ও রীতি-নীতিকে। কলকাতায় আসার আগে তিনি মাদুরার মন্দির দেখে এসেছেন। সেই মন্দিরদর্শনের আনন্দ মাদাম এমনই উজ্জ্বল উত্তপ্ত সঙ্গীতময় ফরাসিতে ব্যক্ত করলেন যে, তা শুনে সাংবাদিক বুঝতে পারলেন, ওঁর সঙ্গীত কোন্ আগুন জ্বালিয়ে তোলে। মাদাম এইসঙ্গে কিছু ভারতীয় সঙ্গীতের সুরও তুলে নিয়ে যেতে চান, যা তিনি আগামী মরশুমে লণ্ডনে গাইবেন। ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে সামান্য পরিচয়েই তিনি বুঝেছেন, ভারতীয় জনগণের আছে প্রকৃষ্ট সঙ্গীতচেতনা, এবং এখানকার গীতি-পদ্ধতি অনুশীলনের যোগ্য। বরোদার মহারাজ ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছেন। ইউরোপীয় নোটেশনে ভারতীয়

সঙ্গীতকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে—বরোদার মহারাজার কাছে এই কথা শুনে মাদাম তা পাবার জন্য বিশেষ আগ্রহী।

সাংবাদিককে মাদাম কালভে তাঁর পৃথিবী-ভ্রমণের বিচিত্র কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলেন। কলকাতা তাঁর কাছে আকর্ষণীয় ঠেকেছে: "সুন্দর শহর। অত্যন্ত সজীব। হাওড়া ব্রিজ থেকে সবচেয়ে চমকপ্রদ দেখতে তার প্রাসাদতুল্য ভবনগুলি, তার বর্ণময়তা, তার প্রাণ—।"

ইতালির সেরা এক টেনর* সিনর গালেও গাস্‌পারি এবং ফ্রান্সের উচ্চশ্রেণীর পিয়ানোবাদক মঁসিয়ে জাক্, মাদাম কালভের দলে আছেন। বৃহস্পতিবার এঁরা সকলে গীত-বাদ্যের আসরে অংশ নেবেন। ইংলিশম্যানের লেখকের মতে, ঐ দিনটি হবে কলকাতার ইতিহাসে এক মহাদিন:

"We are justified, under the circumstances, in calling Thursday, the 24th instant, a red-letter day in the history of Calcutta."

২৪ তারিখের সেই 'মহাদিনে' কলকাতার 'থিয়েটার রয়ালে' হাজির হলেন—অন্য কেউ নন—স্বয়ং ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়া, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লেডী হার্ডিঞ্জকে সঙ্গে নিয়ে। সঙ্গে ছিলেন পার্শ্বচরগণসহ গোয়ালিয়র ও বিকানীরের মহারাজারা। সেকালের ভাইসরয়—তাঁর গান-শোনা—সে তো মহারাজকীয়, মহাভারতীয় কাণ্ড! এবং ভাইসরয় সদ্য এসেছেন কলকাতায়—কার্যত ধুলোপায়ে গেছেন কনসার্টের আসরে। সে আসরে কিন্তু কলকাতা ভেঙে পড়ে নি, তার কারণ—ঐকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ। রাজনীতি তখন ঘুরপাক খাচ্ছে প্রচণ্ড বেগে: স্বদেশী আন্দোলনের তোড়ে বঙ্গবিভাগ রদ করতে হবে, সেই ব্যবস্থা করতে লর্ড মিণ্টোর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন লর্ড হার্ডিঞ্জ; রাজধানীও স্থানান্তরিত

---

* পুরুষ গায়ক, চড়ে সুরে যিনি গান করেন। সাধারণতঃ অপেরার প্রধান পুরুষ গায়ক।

হবে দিল্লীতে ; সেখানে দরবারে উপস্থিত থাকবেন পঞ্চম জর্জ ; মাত্র এক সপ্তাহ আগে তা ঘোষিত হয়েছে ; সুতরাং পরিস্থিতি সঙ্গীতের আসরের অনুকূল নয়। তাহলেও কালভের গানের আসরে শ্রোতারা পাগল হয়ে ছুটে আসে নি বলে ইংলিশম্যানের লেখকের মর্মপীড়ার অবধি ছিল না। সবিশেষ সঙ্গীতরসিক ইনি, কালভের গানের কিছু রসায়িত বর্ণনার দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন ঃ

"মাদাম কালভের গানের বিষয়ে এমন কী বলা সম্ভব যা পুনঃ পুনঃ বলা হয় নি ইতিমধ্যে ?···একালের কনসার্টের আসরে তাঁর সমতুল অল্পই আছেন। এমন কোনো আবেগ নেই যা তাঁর কণ্ঠে অনুরূপ আবেগ তোলে না। তাঁর শিল্পপ্রতিভার অনায়ত্ত নয় কোনো অভিব্যক্তিই। বিরাট শিল্পীর কাছে পরিবেশের ভালো বা মন্দ রূপ গণ্য ব্যাপার নয়। কালভের মতো গায়িকা শ্রোতাকে প্রতিদিনের জীবন থেকে টেনে এনে একেবারে আত্মহারা করে দিতে পারেন—মঞ্চের সাদা-মাঠা আসবাবগুলিও যেন বদলে গিয়ে সুর-জগতের উপাদান হয়ে ওঠে —সৃষ্ট হয় রোমান্সের পরিবেশ—যা কখনো গাঢ় ট্রাজেডির, কখনো রাখালিয়া সরলতার।···ডেভিডের 'পার্ল অব ব্রেজিল' থেকে মিসোলি-সঙ্গীতগুলি গেয়েছিলেন আশ্চর্যজনক সহজতা ও মাধুর্যের সঙ্গে—সে সঙ্গীত যদি তাঁর স্বরের রেশমী মসৃণতা দেখিয়ে দেয়·· পরে গুনো-র সাফো-র বিদায়সঙ্গীত যখন গাইলেন তখন আবির্ভূত হল সেই অভিনেত্রীশিল্পীর কণ্ঠস্বর, যা ক্লাসিক "ট্রাজেডির উচ্চশিখর ও নিম্ন গহনকে ক্রমান্বয়ে স্পর্শ করতে সমর্থ।"

পরাধীন ভারতের মুখ্য রাজপ্রতিনিধি কালভেকে সম্মান জানাতে তাঁর সঙ্গীতের আসরে উপস্থিত হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু সেই সম্মান কালভের জীবনে অভাবিত কিছু নয়, কারণ স্বয়ং সাম্রাজ্যেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ছিলেন কালভের গুণমুগ্ধ, উইণ্ডসর-প্রাসাদে কালভের প্রভূত সমাদর—কালভে কলকাতায় বিশেষভাবে চেয়েছিলেন একটি পরম

প্রণামে নত হতে, তাঁর সমস্ত সঙ্গীতপ্রতিভা দিয়ে একটি প্রার্থনা-গীতিকে সত্য করে তুলতে ঃ 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।'

কালভে গিয়েছিলেন মৃদু দীপালোকিত একটি সমাধি-মন্দিরের সন্ধানে—এক সন্ন্যাসীর শেষ শয়নস্থলে। সন্ন্যাসীর দীর্ঘ দণ্ডের ছায়া একদিন পড়েছিল দুই গোলার্ধে, তাঁর কমণ্ডলুর বারিবিন্দু ঝরেছিল অনেক তৃষিত ওষ্ঠে। সে অমৃতবিন্দুতে কালভেও প্রাণ-প্রাপ্ত।

কিন্তু সে কথা এখন নয়।



নানা আকাশের তারা

হুর্‌রে হুর্‌রে হুর্‌রে। খট্‌-খটা-খট্‌ খট্‌-খটা-খট্‌। ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়ার দল ছুটেছে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে—ঘোড়ার পিঠে টেক্সাসের কাউ-বয় ছোকরারা—বাঁ হাতে টুপি তুলে ধরেছে, ডান হাতে সাঁই-সাঁই চাবুক কষাচ্ছে, মাঝে-মাঝে রেকাবে ভর করে দাঁড়িয়ে উঠছে—মুখে দীর্ঘ কু-উ-উ—আর, হুর্‌রে কালভে! হুর্‌রে হুর্‌রে!

নিউইয়র্ক মেট্রোপলিটান অপেরা-দল আমেরিকা সফর করছে। টেক্সাসের একটি ছোট স্টেশনে যখন ট্রেন এসে পৌঁছল তাদের নিয়ে, তখন কয়েক শো কাউবয় ঘোড়া ছুটিয়ে এসে ট্রেন ঘিরে ধরল—তারা

গান শুনবে। টগ্‌বগে জ্যান্ত ছেলেগুলি। ম্যানেজার ম'সিয়ে গাত্তি গায়িকাদের বললেন, "এদের অনেকেই ইংলণ্ডের বড় ঘরের ছেলে, অনেকদিন দেশছাড়া, এদের একটু আনন্দ দাও।" তখন সুরপক্ষিণী মেল্‌বা কামরার পিছনের প্ল্যাটফর্মে গিয়ে গান ধরলেন তাঁর নাইটিং-গেল গলায়। পরিচ্ছন্ন স্থির বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল অপরূপ কণ্ঠস্বর—তিনি গাইছিলেন—'হোম, সুইট হোম্‌।' ঘরছাড়া ছেলেগুলির বুক কেমন করে উঠল, দীর্ঘশ্বাসে কাঁপল, তারা পরস্পরের কাঁধে মাথা রেখে আকুল হয়ে কাঁদল।

মেল্‌বা'র গান শেষ হলে ম'সিয়ে গাত্তি বললেন, "কালভে এবার তোমার পালা। ওরা কেঁদেছে—ওদের হাসাও।" কালভে তখন লক্‌-লকিয়ে উঠলেন—পাগল-করা, মাতাল-করা স্প্যানিশ সুর ধরলেন দ্রুত লয়ে—সেইসঙ্গে নৃত্যরঙ্গে দুলতে লাগল শরীর। তার প্রতিক্রিয়া হল বটে—"মাতিয়া পাগল নৃত্যে হাসিয়া করিল হানাহানি ছুঁড়ি পুষ্পরেণু।" তারপর গানশেষে উচ্চ হর্ষধ্বনি আর জয়ধ্বনির মধ্যে যখন ট্রেন চলতে লাগল তখন টুপি নড়ছে, রুমাল উড়ছে, আর চীৎকার চীৎকার। ট্রেনের সঙ্গে ছুটল ঘোড়সওয়ারেরা গতি ও শব্দের ঘূর্ণিঝড় তুলে। ঘোড়সওয়ারদের হারিয়ে দিয়ে শেষে ট্রেন যখন ছুটে বেরিয়ে গেল তখন পিছনে রইল, কালভে দেখলেন, পাক-খাওয়া ধূলির মেঘ।

সেই মেঘ সরে গিয়ে ফুটে উঠল আর একটি ছবি।

মেট্রোপলিটান অপেরা-পার্টি দীর্ঘ ভ্রমণের শেষ পর্বে পৌঁছেছে আট-লান্টিকের ধারে পিটসবার্গে। গায়ক-গায়িকারা এখন চূড়ান্ত ক্লান্ত। এক সন্ধ্যায় কালভে ও সালিনাক একসঙ্গে গাইবেন।

সালিনাক কালভেকে ডেকে বললেন, "ছাখো, আর পেরে উঠছি না। দুজনই এখন সামর্থ্যের শেষ সীমায়। অথচ স্টেজে উঠলে কি-যে হয়,

কি-যে ভর করে,আমাদের একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, মনে হয় যেন আজ সন্ধ্যার গানের উপরেই জীবন-মরণ নির্ভর করছে। তারপর অভি-নয় শেষ হলে দেখি, আমাদের রক্ত শুষে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু আর না, ও-জিনিস আর হতে দেওয়া হবে না—তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। আমাদের বাঁচতে হবে।"

কালভের মনের কথা টেনে বলেছেন সালিনাক। তিনি সানন্দে রাজি।

'বার্বার অব সেভিলে'র গান আরম্ভ হল—সালিনাক গাইছেন। উইং-সের আড়াল থেকে কালভে দেখতে চাইলেন—দর্শক কারা? একে-বারে পিছন দিকে কমদামী আসনে ও-কারা সার দিয়ে বসে আছে? ঝোব্বাঝুব্বি-পরা কালিঝুলি-মাখা লোকগুলি, কয়লার গুঁড়োয় মুখ কালো, অন্ধকারে কেবল ঝকঝক করছে চোখগুলো। নিঃসন্দেহে কয়লা-কাটার দল।

"হতভাগ্যরা!" কালভের বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে।—"পাই-পাই পয়সা জমিয়ে ওরা টিকেট কেটেছে, বাড়ি ফিরে পোশাক বদলাবার সময় পর্যন্ত হয় নি, খনি থেকে সোজা ছুটে এসেছে, জীবনে বোধহয় এই প্রথম গ্র্যাণ্ড অপেরা দেখবে—ওদের বঞ্চনা করব—না না না—।"

সালিনাককে কালভে ডেকে বললেন, "ওদের দিকে চেয়ে ছাখো। ওদের কাছে প্রাণ ঢেলে গাইব না—বলো? ক্লান্ত আমরা ঠিক—তবু—ওদের অনেকে হয়ত আমাদেরই দেশ-গাঁয়ের লোক—কত আশা নিয়ে এসেছে—ওদের ফাঁকি দেব?"

উদার উষ্ণপ্রাণ সালিনাক তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন। সে রাত্রে তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে গাইলেন—আবেগ ঢেলে দিলেন—স্নায়ুতন্ত্রী ছিঁড়ে যেন কণ্ঠের বীণার তার তৈরি করে বাজালেন। তারপরে যখন শেষ করলেন, সমবেত আনন্দের মহাপ্লাবনে ডুবে গেলেন তাঁরা। শ্রমিকেরা এগিয়ে এলো অভিনন্দন জানাতে। মানপত্র লিখে এনেছিল তারা। মস্ত এক

ফুলের তোড়ার সঙ্গে তা অর্পণ করল কালভেকে। তারপর খাঁটি ল্যাটিন রীতিতে একে-একে সকলে কালভেকে আলিঙ্গন করে দুই গণ্ডে এঁকে দিল সমাদরের চুম্বন। তারা চলে যাবার পরে দেখা গেল কালভের মুখ কয়লার চিমনির আকার ধারণ করেছে। কিন্তু তারই মধ্যে মর্মে বাজছে সৎ শিল্পীর জীবনসত্যের ঝঙ্কার:

"যখন ক্লান্ত থাকি তখন চেষ্টা করি সবটা না দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে। তার ফল হয় জঘন্য। ছোট হয়ে যাই নিজের কাছে। তখন আবার ঝাঁপ দিয়ে পড়ি—ঢেলে দিই আমার আনন্দ, আশা, প্রাণ, জীবন—তাতে ফিরে পাই নিজেকে। যত দিই—দেবার জিনিস পেয়ে যাই—"

মহাশিল্পী এমা কালভে। চল্লিশ বছরের শিল্পীজীবন তাঁর। গোড়াকার অল্প কয়েক বছরের কথা বাদ দিলে সাফল্যের সিংহাসনে আসীন ছিলেন শেষ অবধি। খুব কম গায়িকার পক্ষেই তাঁর মতো দীর্ঘ দিন ধরে ইউরোপ আমেরিকার সঙ্গীতজগতে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হয়েছে। সঙ্গীতজগৎ থেকে যখন বিদায় নিয়েছেন, কণ্ঠ নীরব, আলোকিত মঞ্চে দ্যুতিবিকীর্ণ চেহারা নিয়ে উপস্থিত নেই, যখন কেবল স্মৃতি মাত্র, তখনো ইতিহাস থেকে মুছে যান নি। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের অনেক ইতিহাসে, বিশ্বকোষে, মর্যাদার সঙ্গে তাঁর গীতিকার্তি উল্লিখিত আছে দেখেছি, কোনো-কোনো ভূমিকায় এখনো তাঁকে সর্বোচ্চ শিল্পী মনে করা হয়। আর যখন পূর্ণ প্রতিভায় গাইতেন, তখনকার উচ্ছ্বাস তো সীমাহারা। তখন রাজা-মহারাজারা তাঁর অভ্যর্থনা করেছেন, রাণীরা খুলে দিয়েছেন গলার মালা, কবিরা তাঁর উদ্দেশ্যে কবিতা লিখেছেন, সুরকার তাঁকে মনে রেখেই রচনা করেছেন বিশেষ সুর, সাহিত্যিক উৎসর্গ করেছেন গ্রন্থ, শিল্পী এঁকেছেন ছবি, ভাস্কর তৈরি করেছেন

মূর্তি, আর আশীর্বাদ করেছেন ঈশ্বর-পথিক।

সফল জীবন। শুধু আলো আর উৎসব। সত্যই তাই? অন্ধকার নেই? নেই বঞ্চনা, হতাশা, আর্ত আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস? পাদপ্রদীপের আলোয় যাঁর মুখ দেখি, তিনি যখন চলে যান সাজঘরে তখন সেখানে কোন্ মানুষ তিনি? কী আছে তাঁর জন্য—শান্তি, সুখ, নিরাপত্তা? না-কি বিলাসের বিপুল আয়োজনের আশ্রয়ে একটি লুণ্ঠিত মূর্ছিত কান্না শুধু?

শিল্পীকে তাই আমরা জানতে চাই। যখন পর্দা উঠেছে, ঝঙ্কারে-ঝঙ্কারে প্রমত্ত বাদ্যযন্ত্র, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা শত-শত দর্শকের উৎসুক দৃষ্টিকে ধন্য করে অভিবাদনের ভঙ্গিতে বলেছেন: 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন': 'গ্রিটিংস মাই ফ্রেণ্ডস অ্যাণ্ড কমরেডস'—তখন তাঁদের সেই স্বরচিত বা পরিচালক-রচিত চেহারাকেই কেবল আমরা দেখতে চাই না—তার অন্তরালের জীবন, যাকে রচনা করেছেন স্বয়ং বিশ্বশিল্পী, তাকে দেখার ইচ্ছাও হয়—যদি সত্যই সে সুযোগ পাওয়া যায়। সে সুযোগ আমরা পেয়েছি মাদাম কালভের আত্মজীবনী পড়ে। যথার্থ একজন শিল্পীর জীবনের ইতিহাস সেখানে লেখা আছে—জীবনের কাব্য—সঙ্গীত—নাটক—উপন্যাস। এক শিল্পীর কাহিনীতে পাই অনেক শিল্পীর কাহিনী, এক কালভের কাহিনীতে মেলে, পূর্বের পরের অনেক কালভের কাহিনী। সেই জীবনচিত্রকে অংশে-অংশে তুলে আনব, দেখব উচ্ছলতার সঙ্গে উদ্ভাসনকে, শিখরকে এবং গুহাগহ্বরকে, জ্যোৎস্নার আলোর সঙ্গে অন্ধকারের মিত্রতাকে, ঝড়ের কান্না কিভাবে মহাশঙ্খরবে বিদীর্ণ হয়—সেই পরমাশ্চর্য রূপান্তরকে। দেখব দ্বিপ্রহরের সূর্যকে এবং সূর্য-গ্রহণকে। দেখব মানুষকে—আমি-তুমি-সে-ও—সব মানুষকে।

কালভে: রিচার্ড ওয়াটসন গিলডার লিখেছেন:

Sweetness and strength high tragedy and mirth,
And but one Calve on the singing earth.

মধুরতা ও শক্তি, দারুণ ট্রাজেডি ও উচ্ছল রঙ্গ—সে কে ?
সে কালভে—সঙ্গীতজগতে একমাত্র কালভে ! কালভে !

..বল সঙ্গীতজগতে কেন, কালভের জীবনজগতেও কি নানা সুরের সম্মিলন ঘটে নি ?

কালভের জীবনগ্রন্থের পৃষ্ঠা ওল্টানো যাক ।

মহাপ্রতাপশালী জারের আমলে কালভে রাশিয়ার রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবার্গে গেছেন গান গাইতে। প্রকাশ্য অবতরণের আগে হ্যামলেটের রিহার্সালে তিনি অংশ নেবেন। ইম্‌প্রেসারিও এসে বললেন—কালভে যেন অতি সুন্দর সাজে রিহার্সালে যান কারণ ওখানে উপস্থিত থাকবেন রাজপরিবারের লোকেরা। ওঁরা বহিরাগত শিল্পীকে আগে-ভাগে দেখে নিতে চান।

থিয়েটার-হলে পৌঁছে কালভে দেখেন-- দারুণ ব্যাপার ! রিহার্সাল দেখতেই হল ঠাসা-ভর্তি। প্রচুর অভিজাত নারী-পুরুষ সমবেত। নৌ-বিদ্যালয়ের সকল ক্যাডেট হাজির, বহু অফিসারও সেই সঙ্গে। আরম্ভের আগে কালভের কাছে এসে পৌছল একরাশ পদ্মগাঁথা একটি মালা, গ্র্যাণ্ড ডাচেস ভ্লাদিমির পাঠিয়েছেন, ওফেলিয়ার উন্মাদ-দৃশ্যের জন্য।

পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী কালভে রিহার্সালেও প্রাণ ঢেলে গাইলেন। দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশে জড়িয়ে নিয়েছিলেন গ্র্যাণ্ড-ডাচেসের দেওয়া পদ্মমালা, শেষ দৃশ্যে সে মালাকে লুটিয়ে দিলেন কাঁধের উপরে। পাগলিনী ওফেলিয়া পাগল করে দিল তরুণ রাশিয়ানদের। তারা যেমন শিল্পপ্রেমিক তেমনি উত্তেজনাপ্রবণ। শেষ দৃশ্যের পরে দর্শকের অভি-

নন্দন নেবার জন্য কালভেকে অন্তত কুড়িবার ফিরতে হল। সেখানেই শেষ নয়, শেষবার যখন এসেছেন তখন প্রথমে বিস্ময়ে, তারপর আতঙ্কে দেখেন— ক্যাডেটরা ছুটে আসছে মঞ্চের দিকে, মঞ্চে উঠে পড়ল তারা, যন্ত্রবাদকদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, ফুটলাইট টপকে, স্টেজে উঠে, কালভেকে ঘিরে ধরল, স্তুতি ও সহর্ষ চীৎকারে তাঁকে ডুবিয়ে দিয়ে খ্যাপার মতো হস্তচুম্বন, স্কার্ফ চুম্বন, জামার আস্তিন চুম্বন করে চলল, তাতেও যথেষ্ট হল না, একজন আবেগের মাথায় প্রচণ্ড কামড় দিল কালভের হাতে।

কষ্টের আনন্দে ককিয়ে কালভে বললেন, "বন্ধুগণ! বন্যগণ! তোমরা কি আমাকে একেবারে খেয়ে ফেলতে চাও? পথ ছাড়ো, যেতে দাও।" তারপরে হঠাৎ-ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে কালভে ছিটকে ঢুকে গেলেন ড্রেসিংরুমে, আর দরজায় খিল লাগিয়ে দিলেন।

এই এক দৃশ্য—যেখানে উৎসাহী তরুণেরা পর্দা ছিঁড়ে মঞ্চে উঠে পড়েছিল। এই সেণ্ট পিটার্সবার্গেই আবার বিপরীত ঘটনাও ঘটেছে।

রাজসভায় প্রতিপত্তিশালিনী এক মহিলা কালভেকে বাড়িতে গান গাইবার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন। অপূর্ব সজ্জিত তিন ঘোড়ার ত্রোইকায় বসিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মহিলার বাড়িতে কালভের সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্য উপস্থিত আছেন এক প্রসিদ্ধ বাদক। কালভেকে এক মস্ত জনশূন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে মহিলা বললেন, "গান শুরু করুন।"

কালভে, সবিস্ময়ে: "এখানে গাইব, কার জন্যে? শুনবে কে?"

মহিলা: "অতিথিরা সবাই হাজির। ওঁরা আছেন পর্দার অন্তরালে। ওঁরা নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নন। ওঁদের জন্য গান ধরুন।"

সুতরাং কালভে প্রাণপণে গাইলেন পর্দার উদ্দেশ্যে। যবনিকা অবশ্য একেবারে অকম্পিত ছিল না, মাঝে-মাঝে সুখ ও তৃপ্তির শ্বাস তাকে

কাঁপিয়েছিল। রাজপ্রাসাদেও কালভে একইভাবে গান গেয়েছেন।

রাশিয়ায় স্বল্প অবস্থানেই কালভে রাশিয়ান ভাষার (এবং যে-কোনো ভাষার) মূল দুটি শব্দ শিখে ফেলেছিলেন—'দা' অর্থাৎ হ্যাঁ, এবং 'নিয়েৎ' অর্থাৎ না। সেন্ট পল ক্যাথিড্রলে ভূতপূর্ব জারের জন্য জাঁকজমকপূর্ণ স্মৃতিবাসর হবে, ফরাসি দূতাবাস থেকে কালভেকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কালভে যথাসময়ে হাজির। একেবারে সেরা সাজে গেছেন, রাজকীয় ঐশ্বর্যে যেন ঝলমল করছেন—এগিয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন ব্যবস্থাপক। তিনি রাশিয়ান ভাষায় কী যেন বললেন। সমুন্নত অহঙ্কারে, বদান্য হাসি ছড়িয়ে, কালভে তাঁকে উপহার দিলেন অধিগত রুশ-শব্দভাণ্ডারের পুরো অর্ধাংশ—"দা।" তৎক্ষণাৎ একেবারে নত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করলেন ব্যবস্থাপক, মহা আড়ম্বর করে নিয়ে চললেন নির্দিষ্ট স্থানে, সংরক্ষিত আসনের সর্বোচ্চে তাঁকে বসালেন। বেষ্টনীর বাইরের দর্শকেরা সতৃষ্ণ কৌতূহলে কালভেকে দেখতে লাগল। কালভে ভাবলেন, ওঁর চমৎকার আসনের জন্য দর্শকেরা কত না ঈর্ষা বোধ করছে। মহান মর্যাদায় তিনি গরীয়ান হয়ে বসে আছেন—এমন সময়ে অর্গানে জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠল—ফিরে দেখেন—শোভাযাত্রা করে আসছেন—জার ও জারিনা তাঁর দিকে—বহুসংখ্যক ডিউক ও ডাচেসকে সঙ্গে নিয়ে। গ্রাণ্ড ডাচেস ভ্লাদিমির সেই দলে ছিলেন। কালভেকে দেখে তিনি দ্রুত ত্রস্তপদে এগিয়ে এলেন, চাপা উত্তেজিত স্বরে বললেন, "সর্বনাশ! করেছেন কি? একেবারে স্বয়ং রাজমাতার আসনে বসেছেন?"

ধরণী দ্বিধা হও। সব তালগোল পাকিয়ে গেল। ঝটিতি উঠে কালভে বেরিয়ে এলেন বেষ্টনী থেকে। তারপর সভাস্থলের গোটা অংশ ঘুরে সকলের চোখের উপর দিয়ে হেঁটে তবে তিনি নিজের জায়গায় পৌঁছলেন—নিতান্ত মাঝারি একটি আসন,—চার্চের শেষের দিকে।

না, এত বড় অপরাধ সত্ত্বেও কালভেকে নির্বাসনে পাঠানো হয় নি।

গ্রাণ্ড ডাচেস ভ্লাদিমির শুধু বলেছিলেন, "দেখা যাচ্ছে, কেবল একটি শব্দের দ্বারা আপনি এদেশে অনেক উঁচুতে উঠতে পেরেছিলেন !".

কালভে কেবল অভিজাতদেরই গান শোনান নি। শিল্পীর সৌভাগ্য—তাঁরা উপস্থিত হতে পারেন রাজা থেকে প্রজায়, জমিদার থেকে কৃষকে, শাসক থেকে শাসিতে। কালভের গান শুনতে আসতেন সাম্যবাদী বিপ্লবীরাও। এঁদের একজন—এক মরীয়া তরুণী নিহিলিস্টের সঙ্গে কালভের বিশেষ পরিচয় হয়ে যায়। মেয়েটি আগুনে-পোড়া গলায় জারতন্ত্রের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণের কথা শোনাত। একদিন চরম জ্বালাময় ভাষায় যখন সে অনর্গল বলে যাচ্ছে অকথ্য অত্যাচার উৎপীড়নের কাহিনী—আর তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতিজ্ঞার কথা—নিজের রক্তময় 'বিশ্বাসের' কথাও—কালভে বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইলেন। মেয়েটি বলল, "আমি কেন, এখানে থাকলে আপনিও একই পথে যেতেন। শিল্পীপ্রাণ আপনার, আপনি কখনো সহ্য করতে পারতেন না।"

রাশিয়া থেকে চলে যাবার ৬ মাস পরে কালভে সেই মেয়েটির একটি চিঠি পেলেন :

"সাইবেরিয়া থেকে লিখছি। দেখুন, আমার 'বিশ্বাস' আমাকে কোথায় টেনে এনেছে। আছি ইউরোপের শেষ সীমায়। শীতে ক্ষুধায় মৃত্যুদ্বারে। সতৃষ্ণ মনে কতবার ভাবি সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলির কথা—যখন আমি আপনাকে ওফেলিয়া ও কার্মেন গাইতে শুনে-



নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?

এমা কালভের কাহিনী আপাতত একজন সফল শিল্পীর বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরা জীবনের কাহিনী। কিন্তু সাফল্য যদি পেয়ে থাকেন কিভাবে পেয়েছেন, অনিবার্য ব্যর্থতাগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে কত রক্ত ঝরেছে, কি পেয়েছিলেন জন্ম ও পরিবেশসূত্রে, অর্জন করেছিলেন কতখানি নিজ শক্তিতে—মানুষ সম্বন্ধে আগ্রহীদের কাছে সে ইতিহাসের মূল্য অপরিসীম।

সুতরাং এখন যাওয়া যাক নদীর উৎস সন্ধানে।

দক্ষিণ ফ্রান্সের অ্যাভেইরঁ-তে ১৮৫৮ সালে স্বল্পবিত্ত এক পরিবারে কালভের জন্ম। ক্যাভেন পর্বতমালার প্রস্তরসঙ্কুল বন্য উচ্চভূমিতে বহু পুরুষ ধরে এঁদের বাস। স্থানটি কঠোর, জনহীন। চুণাপাথরের উদ্ধত শিখরগুলি, নিম্নে গভীর খাদ, উপত্যকা, রহস্যময় গুহা—রোমান্টিক মাদকতায় পূর্ণ। মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে সেখানে আকাশপটে উত্থিত পর্বত শিখরগুলি—সমুন্নত রাজকুমারীর মণিমুকুটের মতো আলোয় ঝলসায়।

দক্ষিণ ফ্রান্সের এই অংশ বাইরের পৃথিবীর কাছে স্বল্পজ্ঞাত। "কিন্তু আমার কাছে সব সময়ই সুন্দরী এই ভূমি। আমি ভালোবাসি এর নির্জন বিস্তার, পাথরের বিচিত্র বর্ণ, এর পাহাড় উপত্যকা। যেন এর মধ্যে রয়েছে মরুভূমির তীব্র আকর্ষণীশক্তি, তার বিষণ্ন নির্জনতা।"

রুথেনিয়ান উপজাতির বাসভূমি এই স্থান। রোমানরা তাদের পরাভূত

করেছিল কিন্তু সহজে পারে নি। সিজার নাকি বলেছিলেন, "ওরা এক অদম্য জাতি, দুর্ভেদ্য অরণ্যের মধ্যে ওৎ পেতে থাকে নেকড়ের মতো।"

সে অরণ্য নেই কিন্তু সে রক্ত যাদের মধ্যে আছে, তারা এখনো বশ মানে নি। তারা ঐতিহ্যকে আঁকড়ে আছে, গভীর ধর্মপ্রাণ, মাটি কামড়ে থাকে।

"এমনই এক বংশের কন্যা আমি—আমিও অনড়। অতীতে প্রোথিত শিকড় আমার। আমি ঐ মৃত্তিকার অংশ—ঐ দক্ষিণের জ্বলন্ত আকাশের। অন্যত্র আমি পরদেশী। যদি আমাকে ভালো থাকতে হয়, যদি আমার সুখ, সাহস ও কণ্ঠস্বরকে ঠিক রাখতে হয়, তাহলে ফিরতেই হবে ঐ ছোট্ট জায়গাটিতে—পর্বতের কোলে ছোট্ট দেশটিতে।"

বালিকা এমা কালভে কয়েকজন সঙ্গিনীর সঙ্গে একদিন দাঁড়িয়ে দেখছিল একটি বিরাট প্রাসাদকে। সমস্ত তল্লাটের একমাত্র প্রাসাদ, পাহাড়ের চূড়োয় সগৌরবে উঠে আছে। সেই মধ্যাহ্নে,উত্তপ্ত আলোর মদ্য গড়িয়ে যাচ্ছে চতুর্দিকে, দুর্গপ্রাসাদটি দেখাচ্ছিল আকাশপটে অঙ্কিত বিশাল জ্বলন্ত শিল্পসৃষ্টির মতো—সেদিকে তাকিয়ে বালিকারা সম্ভ্রমে অভিভূত—এমা ফিস্‌ফিসিয়ে তার সঙ্গিনীদের বলল স্বপ্নাতুর কণ্ঠে—"কে জানে, একদিন হয়ত এই দুর্গপ্রাসাদ আমারই হবে!" প্রথমে অবাক, তারপরেই হাসিতে ভেঙে পড়ে মেয়েগুলি : "কি বকছিস? ঐ মস্ত প্রাসাদ তোর হবে? ওটা বিক্রি হবে শুনলি নাকি? আর হলেই বা কি—তোদের মতো গরিবরা কিনবে ওটা—?"

মেয়েগুলি খিল্‌খিলিয়ে হাসে, এমাও যোগ দেয়, কল্পনাটা কতখানি, অসম্ভব, তা সেও জানে, তবু যদি—

হাঁ, কল্পনা বাস্তব হয়েছিল। এমা তাকে বাস্তব করেছিল! "কিন্তু পথ ছিল কঠিন ও দীর্ঘ···ছিল দুঃখ যন্ত্রণা নৈরাশ্য····কিন্তু দুর্গম পথে যাত্রা যখন শুরু হয়েছে, থামা যায় নি পথের মাঝে···থামা যায় না।"

কালভের জীবনের দ্বৈতের শুরু এখান থেকে। দরিদ্র কৃষিজীবী পরিবারের মেয়ে, নিজেদের গ্রাম্য কুটীরের জন্য গর্বিত, সে একই সঙ্গে স্বপ্ন দেখে প্রাসাদের। নিজেকে যে স্বদেশের মৃত্তিকায় প্রবিষ্ট বলে অনুভব করে, সে প্রাসাদ-স্বপ্নকে সফল করতে ঘুরে বেড়ায় দেশে-দেশে। এবং দক্ষিণফ্রান্সের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যার স্পর্শকাতরতার সীমা ছিল না, সে প্রথম যে-ভাষায় কথা বলেছিল তা ফরাসি নয়—স্প্যানিশ!

নিজ ভূমির প্রতি প্রীতি সত্ত্বেও কালভের পিতা ভাগ্যান্বেষণে গ্রাম ছেড়ে চলে যান স্পেনের একটি ছোট শহরে—কালভের বয়স তখন তিন মাস। সাত বছর বয়স পর্যন্ত কালভে সেখানে ছিলেন। "ফলে আমি প্রথম যে ভাষা বলেছি তা স্প্যানিশ।" যে-উদ্দাম জীবন-চেতনাকে সুরে-অভিনয়ে ব্যক্ত করার প্রতিভায় কালভে অবিস্মরণীয় নায়িকা, সে জীবনের স্বাদও পেয়েছিলেন এই স্পেনেই, অতি শৈশবে, যা তাঁর স্নায়ুতে রক্তে প্রবেশ করে গিয়েছিল। জিপসিরা ওখানে মাঝে-মাঝে দল বেঁধে আসত। ঝলমলে টুকরো কাপড়জুড়ে তৈরিকরা তাদের পোশাক, নাগিনীর মতো লক্‌লকে চেহারা, বিদ্যুৎ-চমকানো চোখ, দুর্বোধ্য ভাষা, ঝোলা-ঝুলির মধ্যে যাদুকরী জিনিষপত্র—কি বিচিত্র, কি রহস্যময়! তারা নাকি ছেলেধরা, ছোটদের ঝুলিতে পুরে নিয়ে পালিয়ে যায়। তাই তারা এলেই মায়েরা বাচ্চাদের সামলাতে ব্যস্ত থাকেন, কালভেকে তার মা কত সাবধান করেছেন, কিন্তু শিশুমনের কাছে জিপসিদের নাচ-গানের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। ছন্দে যখন তাদের শরীর দোলে, থর্‌থরিয়ে ওঠে বাসনার গান, তখন প্রাণমূলে নাড়া খায় শিশুটি। আর···একদিন সে সত্যই টলমল পায়ে হেঁটে গিয়ে জিপসিদের দলে জুটে পড়ল। তার মা রক্ষিবাহিনীকে নিয়ে তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে অবশেষে দেখেন, "সুখী ছোট্ট রাণীর মতো সে জিপসিদের মধ্যে নাচছে, গাইছে, একেবারে খাঁটি জিপসি-রীতিতে।"

মাটির টানে বাঁধা সে—সেই আবার উতরোল যাযাবরী জিপসি-রক্তের আহ্বানে। কালভের ঐ দ্বৈত জীবন।

মানবো না কোনো বন্ধন—কি প্রেমের—কর্তব্যের—নীতির—সমাজের—। কালভে গাইবেন তারই গান বাঁধনছেঁড়া উল্লাসে। চেতনায় তিনি বেপরোয়া জিপসি।

আবার স্থির প্রতিজ্ঞায় বজ্রদৃঢ় এক কালভেও ছিলেন।

কালভের বয়স যখন পাঁচ-ছয় বছরের মতো, স্পেনেই আছেন, তখন সেখানে চলেছে দারুণ রাজনৈতিক উত্তেজনা। সিংহাসনের দাবিদার ডন কারলস্ সৈন্য জুটিয়ে বিদ্রোহ করেছেন, স্থানীয় অধিবাসীদের সহানুভূতিও পেয়েছেন। কালভের মা ভিন্‌দেশী হলেও স্থানীয় অনুভূতির টানে কারলস্-সমর্থক। মহিলা আবেগপ্রবণ ও খেয়ালী স্বভাবের, কিন্তু একই সঙ্গে সাহসী ও প্রত্যুৎপন্নমতি।

একদিন বিকালে শিশু কালভে শোয়ার ঘরে বিরাট ঢালাও বিছানায় শুয়ে আছে, মা কি-একটা করছেন, হঠাৎ দড়াম করে দরজা খুলে একজন টলতে-টলতে ঘরে ঢুকে লুটিয়ে পড়ল। কালভে ককিয়ে উঠল। তার মা কিন্তু বুঝেছেন ব্যাপারটি, চকিতে ছুটে গিয়ে হুড়কো টেনে দরজা বন্ধ করেছেন, লোকটিকে টেনে তুলেছেন, আহত হলেও সে জ্ঞান হারায়নি, হাঁপাতে-হাঁপাতে বলেছে, "আমি কারলস্-পন্থী, সরকারী সৈন্যরা আমাদের তাড়া করেছে, সঙ্গীরা পালিয়েছে, কিন্তু গুলি লেগে এত রক্ত বেরিয়ে গেছে যে পালাবার শক্তি আমার নেই।" কালভের মাকে আঁকড়ে ধরে তরুণ-কিশোর ছেলেটি আর্ত কণ্ঠে বলেছে, "দোহাই. আমাকে লুকিয়ে রাখুন, ঈশ্বরের দোহাই, দয়া করুন!" কথা শোনার মধ্যে কালভের মা কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন, ফালি কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে ফেলেছেন। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে শিশু কালভে সব দেখেছে। কাজ শেষ করে তার মা ছুরির ফলার মতো চোখে তার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়েছেন, তারপর স্থির গলায়

বলেছেন, "খুকি, বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ো।" কালভে উঠতে না উঠতে তিনি চাদর ও পালকের গদি সরিয়ে এক জায়গায় ফাঁক করে নিয়ে সেখানে আহত ছেলেটিকে শুইয়ে দিয়েছেন, তার নিঃশ্বাস নেবার ব্যবস্থা রেখে গদি ও চাদর উপরে বিছিয়ে দিয়েছেন, তারপর বিছানা ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার করে, কালভেকে কোলে নিয়ে, তার চোখে চোখ রেখে বলেছেন, "লক্ষ্মী সোনা আমার, তুমি এখন বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। মনে রেখো, তুমি এখন ঘুমুবে, একটুও নড়বে না। আর শোনো, তুমি কিচ্ছুটি ছাখো নি। বাইরের লোকজন যদি এসে পড়ে—মনে রেখো, তুমি একেবারে কিছু ছাখো নি—"

কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, দরজায় প্রচণ্ড আঘাত। খুলে দিতেই হুড়-মুড়িয়ে ঢুকল সৈন্যরা। তারা কিন্তু কঠিনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে, উঁকি-ঝুঁকি দিয়েও, পলাতক বিদ্রোহীকে পায় নি—না, তাদের পক্ষে 'ঘুমন্ত' শিশুকে জাগিয়ে বিছানা খুঁজে দেখার মতো সন্দিগ্ধ হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

"আমার বয়স তখন চার-পাঁচ বছরের বেশি নয়। কিন্তু যে-তীব্র অনু-ভূতি বোধ করেছিলাম, দারুণ আতঙ্ক ও উত্তেজনা—তা এখনো মনে জীবন্ত। ওটা যেন গত সপ্তাহে ঘটেছে। জীবনে সেই প্রথম একটি নতুন আবেগ অনুভব করেছিলাম, দারুণ এক দায়িত্ব, কারণ আমার মা আমাকে এটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—তাঁর জন্য, এবং ঐ আহত কিশোরটির জন্য আমার নড়াচড়া করা বা কেঁদে ওঠা চলবে না।… কয়েক মুহূর্তে পেয়েছিলাম গভীরতম এক অভিজ্ঞতা—আত্মশাসনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা।"



শিল্পীর জন্ম

কালভের সাত বছর বয়সের সময়ে তার মা স্পেন ছেড়ে এলেন স্বস্থানে। অনেক কষ্টে স্প্যানিশ ভাষা ছড়িয়ে কালভেকে ফরাসি ধরানো হল। তারপর তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল মিলাউ-এ কনভেণ্টে লেখাপড়ার জন্য। ছুটির সময়ে সে আসত তাদের পুরনো পারিবারিক ভবনে। সেখানে পিসি থাকতেন বিশ্বস্তা দাসী মার্গারিদোকে সঙ্গে নিয়ে। অনুভূতিপ্রবণ একটি বালিকার খুশির সব আয়োজন সেখানে ছিল। কালপ্রাচীন বাড়ি, এধারে-ওধারে খামার, গোলাবাড়ি, চারণভূমি, গরু ভেড়ার পাল, প্রান্তর। আর ছিল বাড়ির পিছন দিকের বাগান—পাহাড়ের গা কেটে স্তরে-স্তরে উঠে গেছে—কোনোটা ফলের, কোনোটা সব্জির, কোনোটা ফুলের। এই ফুলের বাগানটি ছিল এমার নিজের জগৎ। রঙ ও গন্ধের জাল-বিছানো বাগানে ডানা মেলে-দেওয়া প্রজাপতির মতো সে ঘুরত আর স্বপ্ন দেখত। 'বালিকা বয়সের প্রথম স্বপ্ন' এখানেই সে দেখতে শিখেছিল। বাগানে অলস গিরগিটির মতো দুপুরের

রোদে সে পড়ে থাকত, অপরাহ্নের মায়াময় আলোয় উঠে বসত, সন্ধ্যার ঘণ্টা পড়লে চলে যেত ঘরের মধ্যে, নতজানু হয়ে প্রার্থনা করত, তারপরে নৈশ আহার শেষ করে গল্প শুনত মার্গারিদোর কাছে। কখনো আসত বুড়ো মেষপালক ব্লাইজ। সে বলত ভূতের গল্প, ভয়ে ককিয়ে উঠত তা শুনে, কিন্তু না শুনেও পারত না। তারপর ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখত—ফুলের, গন্ধের, ভূতের, পরীর···

কনভেণ্টে ফিরে গিয়ে এমা বুড়ো মেষপালকের কাছে শোনা গল্প-গুলোর সদ্ব্যবহার করত বটে! তাতে আরও রঙ চড়াত, যোগ করত অভিনয়ের ভঙ্গি, সঙ্গিনীরা চমকে শিউরে চোখ বড়-বড় করে শুনত। এমা গান করত নিজের সুরে। নিচু করুণ গলায় যখন সে গাইত, তার সহপাঠিনীরা চুপ করে থাকত। নিঃশব্দে তাদের চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ত, কেউ-বা ফুঁপিয়ে উঠত অজানিত কোনো বেদনায়।

একদিন এক সিস্টারের চোখে পড়ল—একটি ছোট মেয়ে কাঁদছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হল, কাঁদছ কেন?" সে বলল, "সিস্টার! খুব মজা হচ্ছিল। এমা কালভে গান গেয়ে আমাদের কাঁদাচ্ছিল।"

"সেই দিনই জন্ম হল শিল্পীর।"

এমা শিল্পীই হল—সন্ন্যাসিনী নয়। কিন্তু সন্ন্যাসিনী হবার স্বপ্ন সে কম দেখে নি। কনভেণ্টে ধর্ম ও মিস্টিসিজমের আবহাওয়ায় এমনই আচ্ছন্ন ছিল যে, স্থির করেছিল নান্ হবে। কনভেণ্টের যাজিকারা গভীর আনন্দের সঙ্গে আশা করেছিলেন, এমা যেন তাই হয়—তাহলে গির্জার আরতি-গীতে এক অসামান্যা দেবদাসীর স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর যুক্ত হবে। শেষপর্যন্ত তাঁদের আশা পূরণ হল না। কনভেণ্টে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এমা বিশিষ্ট দর্শকদের মধ্যে গাইল ফেলিসিয়েন ডেভিড-এর লেজ্ ইর্ঁদেল্ এবং লামার্তিন-এর ল্য লাক্। তা শুনে রোদেজের বিশপ

বললেন, "কি অপূর্ব ! কি আশ্চর্য ! এ কোন্ অজানা কণ্ঠস্বর ! আর এমন অসাধারণ ব্যঞ্জনাময় মুখ ! এ তো শিল্পী !"

বিশপ কথাটা বলেছিলেন মাদার সুপিরিয়রকে। মাদার কিন্তু গভীর বিষাদ বোধ করেছিলেন। কয়েক বছর পরে পাকাপাকিভাবে সঙ্গীত-শিল্পীর জীবনকে নিয়ে ফেলার পরেএমাএকদিন গেলেনপুরনো শিক্ষা-নিকেতন এই কনভেণ্টে। গির্জার সান্ধ্য অনুষ্ঠানে চ্যাপেলের গ্যালারিতে উঠে গিয়ে গাইলেন গুনো-র 'আভে মারিয়া।' সুন্দর গাইলেন। আনন্দে গর্বে মন ভরে গেল, কেননা প্রাক্তন শিক্ষয়িত্রীদের দেখাতে পেরেছেন তাঁদের ছাত্রী কত দূর এগিয়েছে। উৎফুল্ল মনে মাদার-সুপিরিয়র কাছে গেলেন। তিনি বড় স্নেহে এমাকে নিলেন। কিন্তু অতি বিষণ্ণভাবে বললেন, "হায়রে বাছা ! যে চেয়েছিল সন্ন্যাসিনীর পবিত্র পোশাক পরতে,তার এ কী দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি ! মেরী শিশু-বাহিনার নেত্রীর জায়গা হল স্টেজে ! কিন্তু হ্যাঁ,বিশপ তো বলেছিলেন, তুমি জন্মশিল্পী।"

মাদার সুপিরিয়র বললেন, "আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করব।"

"তোমার জন্য প্রার্থনা করব"—একথা স্নেহময়ী পিসিও বলেছিলেন কালভেকে, যখন তিনি ভাইঝির শিল্পীবৃত্তি গ্রহণের কথা শুনলেন : "ওরে দুর্ভাগা মেয়ে আমার, এ তুই কী করলি ? চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত হয়ে গেলি ! আমাদের বাড়ির মেয়ে হল অভিনেত্রী, আগেকার দিন হলে চিহ্নিত পবিত্র সমাধিভূমিতে যাদের ঠাঁই হত না ! কি ভয়ঙ্কর ! কি ভয়ঙ্কর।"

কান্নায় ভেঙে পড়ে পিসিমা বললেন, "আমি তোর জন্য প্রার্থনা করব।"

অনেকেই কালভের জন্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু কোনো প্রার্থনাই তাঁকে আলোকসজ্জিত মঞ্চজীবন থেকে সরিয়ে আনতে পারল না। তবু, কোনো প্রার্থনাই ব্যর্থ হয় না, মরুপথে নদী সত্যই একেবারে

হারায় না—কালভের বাসনার গানের স্বর্ণোচ্ছ্বাসের গভীরে তাই কেঁপেছে উর্ধ্বতর আকূতির শিহর। তারই ফলে কি-না কে জানে, একদিন তিনি এক দিব্য কণ্ঠের আশ্বাস শুনবেন: ঐ যে তুমি মঞ্চে নিজেকে বিদীর্ণ করে সুরের মুক্তি দাও, ও হল পরম মুক্তির অসচেতন চেষ্টা।

"...আমাদের সকল সংগ্রাম মুক্তির জন্য। আমরা সুখও চাই না, দুঃখও চাই না, মুক্তি চাই। মানুষের জ্বলন্ত অশান্ত অতৃপ্ত তৃষ্ণা-- আরো আরো আরো—আরো চাই।...এই আরোর বাসনাই মানুষের অসীমত্বের দ্যোতক। অসীম মানুষ একমাত্র তৃপ্তি পেতে পারে অসীম কামনা—এবং...অসীম প্রাপ্তিতে। আমরা অনন্তের স্বপ্নিকেরা— আমরা দেখব সীমার স্বপ্ন—হায়!...

পনর বছর বয়সে কালভে যখন কনভেণ্ট ত্যাগ করলেন, তখন কেবল তিনি নন, তাঁর প্রতিবেশী ও বন্ধুরাও স্থির করে ফেলেছিলেন, এমা কালভে গায়িকা হবেনই।

গায়িকা অর্থাৎ অপেরা-গায়িকা।

ফ্লোরেন্সে যার জন্ম, ইতালি ও ফ্রান্সে যার বৃদ্ধি, সমগ্র পাশ্চাত্ত্য-জগতে যার ক্রমবিস্তার—সেই অপেরা কঠিন শিল্প, কারণ মিশ্র তার প্রকৃতি। "গানের উপরে প্রধানত নির্ভরশীল হলেও এটি নাটকীয় শিল্প। এতে সজ্জিত মঞ্চ, দৃশ্যপট, পাত্রোপযোগী পোশাক এবং নাটকীয় গতি, সবই আছে। তবে বিষয়ববস্তুকে উপস্থিত করা হয় সম্পূর্ণত বা মুখ্যত অর্কেস্ট্রা-সঙ্গত সঙ্গীতের সাহায্যে। কাহিনী ও সঙ্গীতের ভারসাম্যযুক্ত সহযোগ এখানে—উভয়ের সম্মিলনে যে পরিবেশ ও রসসৃষ্টি হয়, তাকে শুধ্ কাহিনী বা শুধু সঙ্গীতের দ্বারা পাওয়া সম্ভব নয়।" অপেরার ইতিহাসে এমনও দেখা গেছে, এর কাহিনী বহুসংখ্যক সঙ্গীতকে গাঁথার

সূত্রমাত্র। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায়, সঙ্গীতাত্মক নাটকের অখণ্ড আদর্শকে রূপায়িত করতেই সে সচেষ্ট।

এই কঠিন শিল্পের সিদ্ধি তাঁর জীবনেই ঘটবে যিনি একই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং শ্রেষ্ঠ গায়ক। এ কাজ যিনি পারবেন, পৃথিবী তাঁর পায়ের তলায়।

কিশোরী কালভের কৃশ চেহারায় রূপের দ্যুতি, ভাবে-ভঙ্গিতে প্রাণের ছন্দ, দক্ষতা আছে নৃত্যে, কণ্ঠে সুরের ঊষাকাকলি ; নিজেকে নির্মাণ করতে পারলে হয়ত শিল্পের দুর্লভ স্বর্ণসিংহাসনে বসতে পারবেন।

কালভেকে অপেরা-গানের জগতে পাঠাবার সিদ্ধান্তকে কার্যকরী রূপ দেবার ক্ষেত্রে তাঁর মায়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন রক্ষণশীল পরিবারের মানুষ-রূপে সঙ্গীতকে বৃত্তি হিসাবে নেওয়ার সিদ্ধান্ত করা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু তিনি এবং তাঁর স্বামী অনেকটা মুক্তদৃষ্টি। কালভের বাবা অনেক চেষ্টা করেও যথেষ্ট উপার্জন করতে পারেন নি, পুত্রদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য টাকার দরকার, এখন এমা যদি সঙ্গীত থেকে টাকা রোজগার করতে পারে, তাহলে সুরাহা হয়—কালভের মা তাই ভেবেছিলেন। তদুপরি নিজে গান ভালোবাসতেন, গায়িকার জীবনকে তাই নিম্নস্তরের ভাবতে পারেন নি। রীতিমাফিক শিক্ষা না নিলেও চমৎকার গাইতেন, গলা সুন্দর, আর সঙ্গীতের বিস্ময়কর সংগ্রহ - কালভে একবার গুণে দেখেছিলেন অন্তত শ'দুই গান মায়ের মনে আছে। তিনি গাইতেন ফ্রান্সের প্রাচীন গীতি, আঠারো ও উনিশ শতকের মেষপালকদের গান। এই সব সুরের মধ্যে কালভে শৈশব থেকে সঞ্চরণ করেছেন, কনভেণ্টে থাকাকালে সঙ্গীতশিক্ষা অনেকটা এগিয়েছে, সবাই বলছে শিল্পী হিসাবে তাঁর বিরাট ভবিষ্যৎ —কালভের মা স্থির করলেন কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য

প্যারিসে নিয়ে যাবেন। গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে বুকে টান লেগেছিল, নিতান্ত সামান্য একটা ঠাঁই খুঁজে নিয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের সন্ধানে তিনি কতদিন ঘুরেছিলেন—এক বিচিত্র প্রতিশ্রুতির উপহার নিয়ে। শিক্ষকদের কাছে গিয়ে কালভের মা বলেছিলেন, "এই আমার কন্যা। একে যাচিয়ে দেখুন। দেখুন, এ সত্যি গান গাইতে পারবে কিনা? যদি যোগ্য মনে করেন, শিক্ষা দিন। কিন্তু এখন আমার কোনো পয়সা নেই, কিছু দিতে পারব না। তবে আমার কথায় বিশ্বাস করতে পারেন—মেয়ে গান গেয়ে রোজগার করতে পারলেই সব শোধ করে দেবে।"

বিচিত্র প্রস্তাব। উত্তর—প্রত্যাখ্যান—প্রত্যাখ্যান—প্রত্যাখ্যান। কিন্তু ভাগ্য, ঐ শর্তেই রাজি হলেন একজন—জ্যুল প্যুজে। তাঁর কাছে কালভের শিক্ষা আরম্ভ হল।

প্যারিসের মঁমার্ত অঞ্চলে কালভেরা থাকেন, কৃচ্ছ্র কঠিন জীবন তাঁদের। ঝড় বৃষ্টি বরফের মধ্যে আধখানা শহর পায়ে হেঁটে কালভেকে গান শিখতে যেতে হয়। কষ্টে কালভের শরীর শীর্ণ হয়ে গেল।

ঘর থেকে বেরুলেই বাজার, সেখানে মাংসের দোকান, এক মোটা-সোটা কসাই আর তার স্ত্রী দোকান চালায়। গ্রীষ্মের সময় কালভে জানলা খুলে গান করেন—তা শুনে কসাই ও তার গিন্নীর খুব ভালো লাগে। একদিন কালভের মা সেই দোকানে মাংস কিনতে গেছেন, কসাই আলাপ শুরু করল।

কসাই : "আপনার মেয়ের গলা ভারী মিষ্টি। আমি আর আমার বউ এমন গলা কক্ষণো শুনি নি। দারুণ ব্যাপার।'

কালভের মা : "আপনারা সত্যি ভালো, তাই এমন প্রশংসা করছেন। ও খুব খাটে। আশা হয় কোনো একদিন "

কসাই : "হাঁ, চমৎকার গায়। তবে—বড্ড রোগা—একেবারে ডিগ্‌-ডিগে। ওর উচিত রোজ বেশ খানিক মাংস খাওয়া।'

কালভের মা থতিয়ে গেলেন। লোকটা আচ্ছা তো, মাংস বিক্রি বাড়াবার খুব ফন্দী বার করেছে যা-হোক। গোড়ায় প্রশংসায় মানুষের মন গলিয়ে তারপর মাল গছাবার মতলব। বেশ রেগে গিয়ে উত্তর দিতে যাচ্ছেন—

কসাই : "শুনুন, আমি একটা মতলব বার করেছি। আপনার মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সত্যি আমার ভরসা আছে। তাই ওর নামে একটা খাতা খুলব—ওর জন্য যা মাংসের দরকার নিয়ে যাবেন—খাতায় লেখা থাকবে। তারপর যখন গান গেয়ে ও রোজগার করবে, সব শুধে দেবেন, কি বলেন? হেঁ হেঁ, ও হল গিয়ে শিল্পী, সবারই ওকে দেখা দরকার।"



পথ দীর্ঘ, লক্ষ্য বহুদূর..

শিক্ষা! কঠিন শিক্ষা, দুরূহ পথ বেয়ে। মিষ্ট সুরেলা গলা থাকলেই শুধু চলে না, অনেক বিজ্ঞান আয়ত্ত করে তবে শিল্পের জগতে প্রবেশ করতে হয়।

জ্যুল প্যুজে প্রবীণ সঙ্গীতশিক্ষক, তাঁর কাছে তিন বছর কালভে শিখলেন। আত্মবিশ্বাস বাড়াতে ইনি ছাত্রীকে কনসার্টে অংশ নিতে

বললেন। কালভে প্রথম নামলেন ছোট এক প্রেক্ষাগারে, নাম টেয়াট্‌র্‌ দ্য লা ট্যুর দোভার্ন। ৫০ ফ্রঁা পেলেন গানের জন্য। কী নাগর্বের সঙ্গে নিজের প্রথম রোজগার এনে দিলেন মায়ের হাতে।

এর পরে কনসার্ট-দলের সঙ্গে ঘুরলেন ফ্রান্সের নানা স্থানে। তাতে আত্মবিশ্বাস বাড়ল। তারপর চাইলেন অপেরা-গায়িকার ভূমিকায় নামতে। সেই হবে আবির্ভাব। প্রয়োজনও ঘটেছিল। মায়ের পুঁজি প্রায় নিঃশেষিত, রোজগার করা দরকার। কালভের বয়স এখন কুড়ি-একুশের বেশি নয়।

সুযোগ এসে গেল, কিন্তু বড় কঠিন তার চেহারা। ব্রাসেলসের টেয়াটর্‌ দ্য লা মোনে দ্য ব্রুসেল-এর ডিরেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন—"দু সপ্তাহের মধ্যে ফাউস্টের মার্গারিটের ভূমিকায় নামতে পারবে কি?"

"নিশ্চয় পারব"—কালভে তখনি রাজি।

কিন্তু—হাতে মাত্র দু' সপ্তাহ সময়, এবং কালভে ঐ ভূমিকার একটা সুরও জানেন না, কথাও মুখস্থ নেই।

কিন্তু—আছে প্রয়োজন। আছে সম্ভাবনার হাতছানি। তাই প্রতিজ্ঞাও অগ্র ধ্বজাধারী।

কালভে পারলেন। ব্রাসেলসে তাঁর প্রথম অবতরণ সমাদৃত হল। অভিজ্ঞতা যদিও নেই, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর মধুস্রাবী, দেহে যৌবনের মাদকতা, হাব-ভাব-অভিনয়ে সহজ প্রাণস্ফূর্তি।

কণ্ঠস্বরের শক্তি কালভের এক বিরাট শক্তি। তা বহু দূর বিস্তারী, বন্ধুর পথের প্রতিটি অণুকে স্পর্শ করতে সমর্থ, নিম্নগহন থেকে ঊর্ধ্ব আকাশে স্বচ্ছন্দে উড়ে যায়। নাভিমূলের 'এ' থেকে কণ্ঠ উঠে পড়ে উচ্চ 'সি'-এর উপরে 'ই'-তে। তাঁর স্বররাজ্যের ব্যাপকতা এমনই যে, 'এরোদিয়াদ'-এর অন্তর্ভুক্ত 'এরোদিয়া' এবং 'সালোমে'—এই দুইয়ের গানই একসঙ্গে গাইতে পারেন—প্রথমটি কনট্রালটো ভূমিকার, দ্বিতীয়টি সোপ্রানো-র।

ব্রাসেলসে অনেকগুলি ভূমিকায় গাইলেন। ফুলে ফেঁপে উঠলেন যখন মাসে সাতশো ফ্রাঁ রোজগার হল। কিন্তু এইকালে তাঁর কোনো ফাঁপানো কল্পনা—কল্পনাও করতে পারে নি যে, পরে এক সন্ধ্যার গানের জন্য তিনি দশ হাজার ফ্রাঁ পাবেন।

এইকালেই কালভে বিশেষ উদ্দেশ্যে ফাঁপিয়েছিলেন নিজের শরীরকে। সে এক হাস্যকরুণ কাণ্ড।

মোৎসার্টের চেরুবিন গাইতে তিনি নেমেছেন। কিন্তু ইদানীং তিনি সব সময়েই বিব্রত নিজের শ্রীচরণ নিয়ে—রোগা কাঠি সেগুলি, মা বলেন, মাকড়সার ঠ্যাং। কসাইয়ের খাতায় লেখা মাংসের সরবরাহও তাতে মাংসযোজনা করতে পারে নি। এমন ক্ষীণ পদে গাইতে কালভের লজ্জা হল। হঠাৎ মাথায় খেলে গেল দারুণ মতলব। যদি তুলোয় পা মুড়ে তার উপর মাপসই মোজা পরে নেওয়া যায়, তাহলে সবাই হাঁ হয়ে থাকবে।

তুলা-গুরু উরু নিয়ে কালভে গাইতে আরম্ভ করলেন। সামনের সারিতে বসা বৃদ্ধ সমঝদারের চোখ কালভের পায়ে আটকে গেল। তিনি অপেরা-গ্লাস ঠিকঠাক করে এই রম্ভোরু নব যুবতীকে দেখতে লাগলেন। অনেকেই তাই করলেন। এই মনোযোগে কালভে পরিস্ফীত। খুব গাইলেন। সাফল্যে ডগমগ হয়ে মাতঙ্গিনীর মতো মঞ্চ থেকে চলে আসছেন প্রথম অঙ্কের শেষে—উইংসের ধারে দাঁড়িয়ে ডিরেক্টর, দু চোখে আগুন, দন্ত কিড়িমিড়ি—

"হতচ্ছাড়ি, ও কি করেছ? ঐ বিকট ফুলো-ফুলো জিনিসগুলো কী, আমি জানতে চাই। ইচ্ছে করছে ওগুলোর মধ্যে পেরেক ঢুকিয়ে দিই। গরু গরু। বুঝতে পারো নি—তোমাকে দেখে সবাই হাসছে? তুমি বুঝি মনে করেছ, সবাই ঐ ফুলো অংশটাকে তোমার অঙ্গের বাহার মনে করেছে? যাও, ওগুলো দূর করে পরের দৃশ্যে নামবে।"

সুতরাং পরের দৃশ্যে ঝটিতি এক অপারেশনের দ্বারা ভারমুক্ত হয়ে পূর্ব

অঙ্কের গুরুচরণা গায়িকা এলেন সম্মার্জনী-কাষ্ঠিকার মতো পদযুগল নিয়ে। তাঁর এই রূপান্তর দেখে আনন্দের অট্টরবে ফেটে পড়ল দর্শকেরা, যার তুল্য অভিনন্দন, কালভে বলেছেন, ঐ প্রেক্ষাগারে আর কখনো তিনি পান নি।

ব্রাসেলস্ থেকে প্যারিসে ফিরে কালভে পুরাতন শিক্ষককে পেলেন না। তাঁর দেহান্ত হয়েছে। ইনি কালভেকে উৎসাহ দেবার জন্য বলতেন, "তুমি খুব ভালো শিখেছ।" কালভে কিন্তু বুঝেছিলেন, শেখার অনেক বাকি। তাঁর নতুন শিক্ষিকা হলেন মাদাম মার্চেজি। এঁর কাছে অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তি আসতেন বলে সঙ্গীতজগতের বহু দিকপালকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ কালভে পেয়েছিলেন।

এই পর্বেই কালভে ভিক্তর মোরেলের সঙ্গে আবেন আমেত্-এ মুখ্য ভূমিকায় গাইবার সুযোগ পান। মোরেলের কাছে কালভের বিশেষ ঋণ। এই বিখ্যাত ব্যারিটোন, কিভাবে গীতি-উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করতে হয়, তা দেখিয়ে দেন। কিছুদিনের মধ্যে কালভে দ্য জঁসিয়্যার-এর রচনা 'শেভালিয়ের জঁ্যা'-তে মুখ্য ভূমিকাভিনয় করেছেন, সমাদৃতও হয়েছেন। মোৎসার্টের নস্ দ্য ফিগারো-তে চেরুবিন-এর ভূমিকায় গেয়েছেন, মাদাম কার্ভালোর সঙ্গে। মাদাম কার্ভালো অসাধারণ গায়িকা, গুনো-র বহু অপেরায় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন, এক যুগের সঙ্গীতপ্রেমিকদের হৃদয়রাণী, ফরাসি লিরিক আর্টের সুকুমারতার প্রতিভূ—তিনি এই-কালে কালভেকে সঙ্গীতশিক্ষা দিয়েছেন।

তবু—না। এখনো হয় নি। পথ দীর্ঘ, লক্ষ্য বহুদূর।

"আমার কণ্ঠশক্তি এবং নাটকীয় প্রতিভা সত্ত্বেও সাফল্য চমকপ্রদ নয়

ভাবলাম, পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে হয়ত বেশি-কিছু পেয়ে যাব। ইতালিতে যেতে চাইলাম, সেখানে উত্তপ্ততর আকাশের নিচে অবস্থান করে শিল্পের নূতন জগতের সংস্পর্শে এসে আমি বৃদ্ধি পাব—বিস্তারিত হব।”



বেদনার অস্ত্রে আত্মার আবিষ্কার

আঘাত চাই—অপমান!—তবে জাগবে তোমার রক্তাক্ত চেতনা। তারই এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য কালভে নিজের চোখে দেখেছিলেন এই-কালে।

মাদাম ক্রাউস লিরিক ট্রাজেডির গীতাভিনয়ে অনন্যা। অজস্র অবতরণে ধন্য করেছেন বহু ভূমিকাকে। কিন্তু কি বিচিত্র, মোটে মিষ্ট নয় কণ্ঠস্বর, তোতলামির লক্ষণও আছে, চেহারা অসুন্দর, কুৎসিত বলাই ঠিক। কিন্তু গানের সময়ে রূপান্তর ঘটে—সে এমন এক পরিবর্তন যে,

অপেরার অশিষ্ট উন্নাসিক বনেদী দর্শকদের পর্যন্ত অভিভূত করে রাখেন। ত্রিবু্য অপেরার প্রথম রজনীতে কালভে তাঁকে গাইতে শুনেছিলেন। সেদিন যেন ক্রাউস নিজেকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। দেশপ্রেমিকার ভূমিকায় গান গাইছিলেন। শেষ দৃশ্যে মরণাহত সে, ঘিরে আছে সৈন্য-দল, রক্তঝরা কণ্ঠে গাইছে যুদ্ধগীতি। সেই ভূমিকায় ক্রাউস শেষ পতনের আগে আপ্রাণ শক্তিতে নিজেকে ঘষে টেনে নিয়ে গেলেন পাদ-প্রদীপের কাছে এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে উঠতে চেষ্টা করলেন, আঁকাবাঁকা হয়ে শেষে একেবারে উঠে দাঁড়ালেন—কণ্ঠে নিয়ে 'দেবু্য আফাঁ দ্য লিবেরি'—হে আইবেরিয়ার সন্তানগণ!—তার পরেই লুটিয়ে পড়লেন।

কালভে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে ছিলেন একেবারে সামনের সারিতে। ক্রাউসের গান যেন ঠিক তরবারির আঘাতের মতো—একেবারে শরীর ভেদ করে গেল। কালভে চিৎকার করে উঠে দাঁড়ালেন, সবাই বিদ্যুৎ-শিহরিত, একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, সবাই যেন আছড়ে পড়তে চাইলেন ঐ প্রচণ্ড আহ্বানে সাড়া দিয়ে।

এমনই মহীয়সী গায়িকা ক্রাউস—একদিন গাইছিলেন মাদাম মার্চেজির ভবনে। বহু বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়ক উপস্থিত। আছেন সঙ্গীত জগতের তৎকালীন সম্রাট লিস্ট্।

হাঙ্গেরীয় সুরকার ও পিয়ানোবাদক লিস্ট্ (১৮১১—৮৬) নিজকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পিয়ানো-যন্ত্রজ্ঞই নন, অজস্র মৌলিক সুর রচনাও করেছেন। এক্ষেত্রে রোমান্টিক আন্দোলনের প্রধান পুরুষ। অসামান্য প্রতিভাবান ও রূপবান এই মানুষটি—কাম ও ধর্ম—এই দুই বাসনায় সমভাবে তাড়িত। চার্চের সঙ্গে এঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, সেখান থেকে বহু সম্মান পেয়েছেন, চার্চে যোগদানের সম্ভাবনাও ছিল, যদিও বাস্তবে তা ঘটেনি। অপরদিকে প্রতিভার ঐশ্বর্যকে বিতরণ করেছিলেন অজস্রধারে, আর স্বীকৃতির অভিজ্ঞানও বর্ষিত হয়েছিল একইভাবে তাঁর উপরে। ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল লামার্তিন, ভিক্তর উগো, হাইনে-র সঙ্গে। নিজকালের

প্রায় সকল সঙ্গীতশিল্পীকে জানতেন, তাঁদের প্রভাবিতও করেছেন গভীরভাবে—সুরস্রষ্টা, বাদক ও শিক্ষকরূপে। তিনিই প্রথম মঞ্চে পিয়ানো-বাদনের একক অনুষ্ঠান করেন, এবং যখন বীঠোফেন, সুবার্ট, বের্লিয়ৎস্, ভাগ্‌নার প্রভৃতি যথেষ্ট সমাদৃত নন, তখন পিয়ানোয় তাঁদের সুর তুলে, কনসার্টে বাজিয়ে, তাঁদের জনপ্রিয় করেছিলেন।

প্রতিভার জীবনের মতো প্রেমের জীবনও এঁর অফুরন্ত। দীর্ঘজীবনে বহুসংখ্যক পত্নী ও প্রেমিকা গ্রহণ-বর্জনের বদান্যতা দেখিয়েছেন, রূপের প্রতি এঁর তীব্র আসক্তি, লোলা মণ্টেজ পর্যন্ত এঁর কিছুকালের নর্ম-সঙ্গিনী।

লোলা মণ্টেজ! লাস্যময়ী নর্তকী, ব্যাভেরিয়ার রাজ্য প্রথম লুই যাঁকে রক্ষিতা করে ইউরোপে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন, পরে গণিকাকে কাউণ্টেস বানিয়ে নিজ কার্যকে গৌববান্বিতও করেছিলেন, ব্যাভেরিয়ার প্রজারা যে-মোহিনীকে শয়তানী গণ্য করে খেদিয়েও দিয়েছিল, তারপর সারা ইউরোপের লোভাতুর চোখের উপরে যাঁর বাসনার দেহচ্ছন্দ তুলেছে—সেই লোলা।

বিরাট পুরুষ লিস্‌ট্‌ এখন বৃদ্ধ, গান শুনছেন—ক্রাউস মনপ্রাণ দিয়ে গাইছেন। সকলে উচ্ছ্বসিত, লিস্‌ট্‌ কিন্তু নীরব, অবিচলিত, মুখে অভিব্যক্তি নেই। তাঁর ঔদাসীন্যে সকলে পীড়িত।

ক্রাউসের গান শেষ হল। মাদাম মার্চেজি এগিয়ে এলেন লিস্‌ট্‌-এর কাছে। বললেন, "মাদাম ক্রাউস এখন এর্ল্‌কোয়েনিগ্‌ গাইবেন—আপনি কি তাঁর সঙ্গে বাজাবেন?"

বর্বর কণ্ঠে লিস্‌ট্‌ বললেন, "না। তেমন ইচ্ছে নেই। ও ভয়ানক কুশ্রী। আর তোতলামি আছে।"

মাদাম মার্চেজি নাছোড়।

শেষে অসন্তুষ্টভাবে লিস্‌ট্‌ বললেন "ঠিক আছে। তবে সাবধান করে দিচ্ছি, যদি ওর গান ভালো না লাগে, গানের মাঝখানে উঠে চলে যাব।"

বিরক্তভাবে লিস্‌ট্‌ পিয়ানোয় বসলেন। মাথা ঝাঁকিয়ে কেশরের মতো কেশ পিছনে উল্টে দিলেন। ছুরির ফলার মতো আঙুলের নখ-গুলো পিয়ানোর চাবির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুহূর্তে তীব্র ঝঙ্কার তুলল —তিনি সুবার্ট-এর অনবদ্য সঙ্গীতের প্রস্তাবনাকে ধরে নিয়েছেন।

তখন অপমানে বিবর্ণ ক্রাউস উঠে দাঁড়িয়েছেন। লিস্‌ট্‌-এর নিষ্ঠুর নীচ উক্তি তাঁর কানে গেছে। তাঁর মুখ রক্তশূন্য কিন্তু কঠিন, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন আচার্যের মুখের দিকে, শুরু করলেন গান।

কণ্ঠ চিরে যেই বেরিয়েছে সুরের প্রথম তরঙ্গ, অমনি চমকে তাকিয়ে-ছেন লিস্‌ট্‌, বিস্ফারিত চোখ উড়ে গিয়ে মিলেছে ক্রাউসের চোখে, দুই জোড়া চোখ জুড়ে রইল অচ্ছেদ্য আকর্ষণে, আর ওধারে মিলতে লাগল লিস্‌ট্‌-এর যন্ত্রতরঙ্গের সঙ্গে ক্রাউসের কণ্ঠতরঙ্গ। গভীর ঘনিষ্ঠ ।শহরিত অপার্থিব দুই সুরের সঙ্গম—যেন দুই চেতনার মিলন।

"তাঁরা তাঁদের ট্রাজিক ভাবপ্লাবনে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। প্রচণ্ড তা, অবর্ণনীয়। ধীরে লিস্‌ট্‌ উঠে দাঁড়ালেন। যখন শেষ সুরের কম্পন মূর্ছিত হয়ে নীরব হয়ে গেল, তখন তিনি দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন উদ্‌বোধিত গায়িকার দিকে।"

"ভগিনী আমার! পুত্রী আমার! ক্ষমা করো—" আবেগে ভগ্ন কণ্ঠে লিস্‌ট্‌ বললেন।

পরমাশ্চর্য কীর্তির পরে নিঃশেষিত ক্রাউস শুধু অস্ফুটে বলতে পারলেন, "ধন্যবাদ।"

কুড়ি বছর পরে আমেরিকার এক সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে সেকালের সঙ্গীতজগতের প্রধান ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করা হয়—তাঁদের অভিজ্ঞতায় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আলোড়নকারী ক্ষণ কোনটি? যাঁরা পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলে একবাক্যে বলেন, "সে ক্ষণ নিঃসন্দেহে এসেছিল মাদাম মার্চেজির ভবনে যখন লিস্‌ট্‌-এর বাদ্যের সঙ্গে ক্রাউস গেয়েছিলেন।"

কালভে তাঁর প্রাথমিক সাফল্যের মধ্যে অতৃপ্ত ছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন, মধ্যবিত্ততায় আবদ্ধ হয়ে আছে তাঁর উদ্যম। ভিতরে আগুন থাকলেও উপরে অদ্ভুত শীতলতার আবরণ, যাকে সরিয়ে দর্শকের অনুভূতির মধ্যে তিনি প্রবেশ করতে পারছেন না। তাই এসেছেন ইতালির মিলানে, যদি পরিবর্তিত পরিবেশে গুহামুখ থেকে নির্গত হতে পারেন।

মিলানে প্রথম অবতরণের সন্ধ্যায় কি-যে হল—এক অদ্ভুত আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়লেন, কণ্ঠে এলো অসাড়তা, চেতনায় যেন পক্ষাঘাত—ব্যর্থ হলেন একেবারে।

দর্শকেরা ফেটে পড়ল ধিক্কারে। বিষাক্ত হিস্‌হিস্ শব্দ করে তাড়িয়ে দিল তাঁকে। অপমানের চূড়ান্ত।

বিধ্বস্ত কালভে প্যারিসে ফিরে এলেন। গান ছেড়ে দেবেন। কিন্তু না, কালভের এক গুণগ্রাহী তাঁকে মাদাম রোজিনা লাবর্দ-এর কাছে নিয়ে গেলেন, শিক্ষাদানে যাঁর অতুলনীয় ক্ষমতা।

শিক্ষা নেবার যোগ্যতাও কালভে অর্জন করে ফেললেন, যা এলো কঠিনতম ব্যক্তিগত আঘাতের মধ্য দিয়ে।

"অপেক্ষা করো। ওকে দুঃখ পেতে দাও। ও জ্বলুক। দেখবে কোন্ পরিবর্তন ঘটে ওর শিল্পে।"

যদি পাও নিঙড়ানো যন্ত্রণা, তবেই তোমার গান বুকের মাঝখানটিতে ওষ্ঠ রাখবে।

কালভের ব্যক্তিগত জীবনের প্রথম বড় ট্রাজেডি এইকালেই ঘটেছিল—প্রেমের ক্ষেত্রে। তা এমনই যন্ত্রণাদায়ক যে, সে-বিষয়ে কিছু বলতে তিনি অপারগ। কালভেকে ভেঙে চুরমার করে দিল তা, বিছানা নিলেন, বাঁচবার সম্ভাবনা রইল না, পুরো এক বৎসর সেই অবস্থায় কাটল, কিন্তু সহজাত প্রাণশক্তি ও যৌবনশক্তিতে লড়াই করে চললেন, শেষপর্যন্ত

সামলে উঠলেন, কিন্তু আরোগ্য অত্যন্ত ধীরে, আর···সেইকালে অনেক-কিছু পড়লেন, ধ্যান করলেন গভীরে, তাকালেন নিজের দিকে, জানলেন অন্তর্গত আমিকে।

"সেই তীব্র যন্ত্রণা, দহন সহন, আমার আত্মাকে দিল নতুন সংবেদনশীলতা এবং সহানুভূতি। আমি পেলাম জীবন ও শিল্প সম্বন্ধে অনুভবের ব্যাপকতর শক্তিকে। পরে মঞ্চে যখন ফিরে গেলাম, দেখলাম—আমি অবশেষে জেনেছি, কিভাবে শ্রোতাদের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে হয়, পৌঁছতে হয় তাদের সন্নিধানে, কিভাবে তাদের দিতে হয়—আমার উল্লাস, আমার বেদনা, আমার সুখ, আমার দুঃখ···"



চাই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা

"আবার বলো। না, হল না—আবার বলো। না, হল না—আবার বলো।"

মাদাম লাবর্দ কালভেকে দিয়ে ওফেলিয়ার একটি উক্তি একাদিক্রমে আশিবার বলালেন। নিখুঁতের এতটুকু কমে তিনি খুশি নন।

অপেরা-জগতে প্রভূত সাফল্যের অধিকারিণী মাদাম লাবর্দ শিক্ষিকা

হিসাবেও প্রথমশ্রেণীর। তাঁর প্যারিসের গীতি-বিদ্যালয়ের খ্যাতি বহু-বিস্তৃত। প্রকৃষ্ট তাঁর বৈদগ্ধ্য, আপসহীন রুচি। ছাত্রছাত্রীদের শৈথিল্য তিনি সহ্য করতে প্রস্তুত নন। তাদের শোনাতেন, মঞ্চে নিজের প্রথম অবতরণের দিনটির কথা যখন তাঁর কঠোর শিক্ষক বলেছিলেন, "আমি সামনে বসে থাকব। যদি দেখি খারাপ গেয়েছ, মুখদর্শন করব না।" ভয়ার্ত বালিকাটি ভয় জয় করার মরীয়া চেষ্টায় ক্রমান্বয়ে দশটি ক্যাডেনজা-কে কণ্ঠে তুলে নিয়েছিল এবং তাদের সফল রূপায়ণের দ্বারা জয় করেছিল দর্শক ও নিজের শিক্ষককে।

নির্মম শিক্ষকের আরও ভয়াবহ কাহিনী কালভে পরে শুনেছেন। বিখ্যাত গায়িকা মালিব্রাঁ-র পিতা গার্সিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুর। মুগুর হাতে কন্যাদের গান শেখাতেন, আর ভুল দেখলেই ঠেঙাতেন। এক-রাত্রে বালিকা মালিব্রাঁ ডেসডিমোনার ভূমিকায় নেমেছে, ওথেলোর ভূমিকায় তার পিতা। মঞ্চে ঢুকবার মুখে বাবা মেয়েকে চাপা হিস্‌হিসে গলায় বললেন, "শেষ দৃশ্যে যা করতে বলেছি তাই করবে—যদি না করো—।" আতঙ্কিত বালিকা তার ফলে ভালো করে গাইতেই পারল না, ভুল করে ফেলল কয়েকবার, আর বাবার ক্রোধও চড়তে লাগল। শেষ দৃশ্যে যখন ওথেলো উন্মত্ত রোষে ডেসডিমোনার গলায় ফাঁস দিচ্ছে, তখনো মালিব্রাঁ পিতার শিক্ষামতো কাজ করতে পারেনি, ফলে পিতার চোখ বাঘের মতো জ্বলতে লাগল—তাই দেখে হঠাৎ ভয়ে শিউরে উঠে সে পাগলের মতো চীৎকার করে বেরিয়ে এলো মঞ্চ থেকে—"খুন! খুন করে ফেলল আমাকে। বাঁচাও! বাঁচাও!"

না, মাদাম লাবর্দ এমন ঘাতক-শিক্ষক নন, কিন্তু নাছোড় শিক্ষক। কালভেও এমন অনুগত ছাত্রী যে, ইনি খুশি হয়ে বলেছিলেন, "তুমিই আমার সেরা ছাত্রী।" আর বলেছিলেন, "বাছা, আমি কিভাবে শেখাই তা ভালো করে লক্ষ্য করো, কারণ একদিন তোমাকেও শেখাতে হবে।"

কালভে কোনোদিন শিখতে ক্লান্ত নন। জীবনগ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা বাঁধা

নেই, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। এবং তিনি সঙ্গীতজগতের মানুষদের আংশিক মানুষ মনে করতেও রাজি ছিলেন না। তাই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার দিকে বিশেষ জোর দিয়েছেন। সূচনায় আছে শারীরশিক্ষা। অপেরায় যিনিই গায়িকা তিনিই অভিনেত্রী, সুতরাং শারীর সামর্থ্য বিশেষ দরকার। "সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, কোনো একটিমাত্র সন্ধ্যার ভূমিকাভিনয়েব জন্য কতখানি পরিশ্রমের দরকার হয়। স্নায়ু, পেশী ও মনের উৎকণ্ঠার শেষ থাকে না। ভালো লাগুক বা মন্দ লাগুক নির্দিষ্ট সময়ে শিল্পীকে আবেগ ঢেলে দিতে হবে। শ্রোতারা ছেড়ে দেবে না। তারা সবচেয়ে কড়া প্রভু। কার্মেনের মতো ভূমিকায় আমাকে চলতে-ফিরতে-হাসতে-নাচতে-গাইতে হয় একটানা পুরো চার ঘণ্টা, এক মুহূর্তের ছেদ নেই। দুই অঙ্কের মধ্যে পোশাক বদলাবার সময় পর্যন্ত পাওয়া যায় না।"

কালভে বলেছেন, "কণ্ঠের মতো সূক্ষ্ম স্পর্শকাতর যন্ত্রকে অটুট রাখতে হলে নিয়মের ব্যত্যয় একদম চলবে না।" "আমার কণ্ঠস্বর রহস্যময় স্বর্গীয় আবির্ভাবের মতো—সে এসেছে আমার কাছে স্বল্পকালীন অবস্থানের জন্য—যেন অমরাবতীর পক্ষিণী কিংবা অপ্সরা, এখন ছোট বোনটির মতো আমার কাছে রয়েছে, কেন রয়েছে তা জানি না, হয়ত বড় অনুনয়ে তাকে ধরে রেখেছি বলে, কিংবা নিজেকে অযোগ্য গৃহকর্ত্রী প্রতিপন্ন করি নি বলে।"

এর পরে আসে ভূমিকার অনুশীলন। "সে কী কঠোর পরিশ্রম। পার্ট তৈরির ব্যাপারে শর্টকাটের পথ নেই। কোনো শুভপ্রভাতে সুখনিদ্রা সেরে জেগে উঠে দেখা সম্ভব নয়—পার্ট তৈরি হয়ে গেছে। শুধু শব্দ ও সঙ্গীত মুখস্থ করতেই প্রচণ্ড চেষ্টার দরকার। অথচ সেটাই সবচেয়ে সহজ কাজ। তার উপরে আছে নাটকের তাৎপর্য, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, বর্ণিত যুগের পরিবেশ ও প্রকৃতির অনুধাবন। তারপর, প্রতি অঙ্ক, দৃশ্য, না—প্রতিটি বাক্য, বাগ্‌রীতি এবং অন্তর্নিহিত ভাবকে

যথোপযুক্তভাবে উদ্‌ঘাটনের প্রযত্ন, যাতে শেষপর্যন্ত দর্শকের কাছে চরিত্রকে অন্তঃসঙ্গতিসুদ্ধ জীবন্তভাবে উপস্থিত করা যায়।"

শিল্পীকে ইতিহাস পড়তে হয়—ঐতিহাসিক রচনাকে রূপায়িত করার জন্যে। পড়তে হয় দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ধর্মীয় জীবনী—জীবনের রহস্য-গভীরতাকে উপলব্ধি করার জন্য। সাহিত্য পড়তে হয়—রসচেতনা লাভের জন্য। শ্রেষ্ঠ শিল্পকলা দেখতে হয়, যাতে সে বুঝতে পারে কিভাবে কল্পনা মূর্ত হয়। "অর্থাৎ কেবল শ্বাসনিয়ন্ত্রণ, স্বরক্ষেপ, স্বরের বর্ণবিকাশ ইত্যাদি আঙ্গিকগত ব্যাপারেই সঙ্গীতশিল্পী আবদ্ধ থাকতে পারে না, তার অধিকন্তু চাই উচ্চ বুদ্ধি, সুশিক্ষিত মন এবং সংবেদনশীল উদার হৃদয়।"

শিখরাসীন হয়েছেন যিনি, তিনি কিভাবে শিক্ষা নেন, সারা বার্নহার্ড, সালিনাক প্রমুখের দৃষ্টান্ত দিয়ে কালভে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। ছ লারা রচিত মেসালিন-এর ভূমিকাভিনয়ের জন্য স্বয়ং তিনি কিভাবে ক্লাসিক সাহিত্যের ও রোমান ইতিহাসের মধ্যে ডুব দিয়েছিলেন, সে কথা কালভে বলেছেন। কার্মেন সৃষ্টির সময়ে জিপসিদের আড্ডায় গিয়ে সাক্ষাতে সবকিছু দেখে-শুনেছিলেন। ওফেলিয়া সৃষ্টির সময়ে এক মনোচিকিৎসকের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, যিনি তাঁকে উন্মাদাগারে নিয়ে গিয়ে এক তরুণী পাগলিনীকে দেখার সুযোগ করে দেন। "এই হত-ভাগিনী ব্যর্থ প্রেমের ফলে পাগল হয়ে যায়। যা দেখেছিলাম তা এখনো মনে ছবির মতো ভাসছে। ভয়ঙ্কর মর্মান্তিক স্মৃতি। কিন্তু ওফেলিয়ার ভূমিকাকে উপস্থিত করার জন্য ঐ বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল। ওফেলিয়ার উন্মাদ-দৃশ্যের অভিনয়কালে আমি কতবার না ঐ হতভাগিনীর স্মৃতি মনের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছি।"

চরিত্রের মধ্যে অবতরণ করতে হয়, তবেই তার প্রাণরহস্য ধরা পড়ে শিল্পীর কাছে। "যদি গাহন করিতে চাও, এসো নেমে এসো হেথা গগন-তলে।" চরিত্রের গভীরে আত্মনিমজ্জন করতে কালভে সমর্থ ছিলেন

বলে তিনিই বোধ হয় একমাত্র যিনি একই সপ্তাহে কার্মেন ও ওফে-লিয়ার মতো দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকা গাইতে পেরেছেন। কেবল তাই নয়, যেখানে একই চরিত্রকে তিন লেখক ভিন্ন তাৎপর্যে উপস্থিত করে-ছেন—সেখানেও কালভে ঐ তিন রূপকে পার্থক্যসুদ্ধ ফোটাতে পেরেছেন। অদ্ভুত কাণ্ড—একই মরশুমে তিনি গুনো, বের্লিয়ৎস্ এবং বঈতো-র তিন মার্গারিটকে রূপায়িত করেছিলেন প্রতিভার কৌতূহলী বিকাশলীলায়। গুনো-র মার্গারিট সহজ সরল তরুণী, তার গানও সহজ গ্রাম্য আবেগময়, মাধুর্যসিক্ত। বঈতো-এর মার্গারিট মানবিক বাসনাসম্পন্ন, গভীরতর স্বভাবের। বের্লিয়ৎস-এর মার্গারিট উঠে এসেছে মধ্য যুগ থেকে—অনুভূতি ও অভিব্যক্তিতে রোমান্টিক। এদের সকল-কেই যথারূপে কালভে উপস্থিত করেছিলেন।

অপেরা-গায়িকাকে অভিনয় সম্বন্ধেও যথেষ্ট নজর দিতে হয়। মঞ্চে তার প্রতিটি পদক্ষেপে জীবনের ছন্দ বাজবে, তাই প্রত্যাশিত। কার্মেনের চঞ্চল ঘূর্ণি-পদ, মার্গারিটের শান্ত নম্র পদ, ওফেলিয়ার দ্বিধান্বিত বা উদ্‌ভ্রান্ত পদ, সাফো-র চঞ্চল আহ্বানের পদ—পদে পদে জীবনের রেখা।

সঙ্গীতের সৃষ্টিশীল শিল্পী হতে গেলে তার প্রচলিত ব্যাখ্যার উপরে উঠবার চেষ্টা করতে হয়। একদিন কালভের সঙ্গে তাঁর এক বান্ধবীর কথা হচ্ছিল বীঠোফেন প্রসঙ্গে। কিভাবে বীঠোফেনকে গাওয়া উচিত, তা কালভে দেখালেন তাঁর একটি বিখ্যাত গান গেয়ে। কালভের বান্ধবী খুশি হলেন না।

তিনি বললেন, "কালভে, এ কি কাণ্ড। তুমি কি ভুলে গেলে, বীঠোফেন ক্লাসিক। তুমি অত্যন্ত বেশি আবেগ ঢেলে গেয়েছ, নিজেকে একেবারে ছেড়ে দিয়েছ। আরও সংযত হওয়া দরকার ছিল।"

কালভে বললেন, "কিন্তু তোমার কি মনে পড়ে না—বুসোনি এ-ক্ষেত্রে কী বলেছেন? আমার কথা না-হয় নাই নিলে, বীঠোফেনের

সঙ্গীতকে ব্যাখ্যার ব্যাপারে আমার সামর্থ্যকে তুমি অবশ্যই সন্দেহ করতে পারো, কিন্তু তুমি নিশ্চয় বুসোনির মতো বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করবে। তিনি বলেছেন, শ্রদ্ধার পাথর চাপিয়ে আমরা ক্লাসিককে মেরে ফেলি।"

কালভে প্রশ্ন করেছেন, "বীঠোফেন, মোৎসার্টের মতো অমর মহানেরা কি কেবল কতকগুলি পণ্ডিতের কচ্‌কচির সামগ্রী হয়ে থাকবেন? তথাকথিত ক্লাসিক শীতলতা এবং পূর্বনির্ধারিত ভঙ্গিযোগে তাঁদের উপস্থিত করাই কি শিল্পীর পক্ষে একমাত্র উচিত কাজ? বীঠোফেন-- যিনি এত মানবিক - এমন ট্রাজিক—তাঁকে প্রাণহীনভাবে গাই কি করে?"

যে-সব গায়ক-গায়িকাকে এতখানি বিবেচনা বহন করে চলতে হয়, তাঁদের পক্ষে বাধাবন্ধহারা জীবনযাপন করা সত্যই সম্ভব নয়—যদি তাঁরা সঙ্গীতজীবনকে দীর্ঘায়ত করতে চান। কতজন সহজতর জীবনের টানে সঙ্গীতজগৎ ছেড়ে চলে গেছেন! এ-জীবনে লেগে থাকতে হলে লড়বার ক্ষমতা থাকা চাই, আঁকড়ে থাকার ক্ষমতা—নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য—আদর্শ—উদ্যম। "অপেরা জগৎকে যিনি জানেন তিনিই স্বীকার করবেন, জনসাধারণ আমাদের যতখানি মজা-লোটা হালকা মনের মানুষ ভাবে, আমরা সত্যই তা নই।...এখানে পাওয়া যাবে অত্যন্ত স্নেহশীল পিতাকে, আত্মোৎসর্গকারী মাতাকে। এখানকার লোকজনের উদার-তার কথা সর্ববিদিত। প্রায় সকলেই এক বা একাধিক আশ্রিত আত্মীয় বা বন্ধুকে প্রতিপালন করেন। এমন-কি অতি দূর সম্পর্কেরও কেউ, যদি কষ্টে থাকেন, নিন্দের জিনিস হয়ে দাঁড়ায়।"

শিক্ষার্থিনী কালভে নিজেকে দেখতে থাকেন। ভাবেন, দিতে হলে নিতে হবে। গৃহদ্বার খুলে রাখো। তাঁর মনে পড়ে বার্ন জোনস্‌-এর মর্মস্পর্শী চিত্রের কথা। "অন্ধ ভিখারী হাত বাড়িয়ে আছে—পথচারীরা যা দেবে তাই সে নেবে—সোনা বা রাঙ, ভালো বা মন্দ।...আমার

কাছে এই হল শিল্পীর প্রতীক-চিত্র। শিল্পীকে প্রস্তুত থাকতে হবে ·· চলার পথের জিনিসকে আগ্রহে তুলে নেবার জন্য, যাতে সে বিনিময়ে পৃথিবীকে দিতে পারে এমন শিল্প, যা জীবনের যথার্থ প্রতিচ্ছবি—প্রাণময় জীবনময় সৃষ্টি।"

না, কালভে সম্পূর্ণ ঠিক বলেন নি। শিল্পী অন্ধ নয়, চক্ষুষ্মান ভিখারী। সে যদি ত্যাজ্য ধিক্কৃতকে তুলে নেয়, জেনে বুঝেই নেবে, জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসাবে।

কালভে নিজে তাই করেছিলেন।



সমাধিতে জয়েন্দ্র

সমালোচনায় আহত হয়ে শিল্পীরা আত্মহত্যা করেছেন, এমন ঘটনা বিরল নয়। কালভের বন্ধু-বান্ধবীদের মধ্যেও কেউ-কেউ সে কাজ করেছেন। কালভে নিজে অমন দুর্বল মনের মানুষ নন। "হা ভাগ্য! যদি প্রতিটি বিরূপ সমালোচনার ক্ষেত্রে আমাকে আত্মহত্যা করতে হত তাহলে ইতিমধ্যে শত-শত মৃত্যু হয়ে গেছে—"

কিন্তু যদি জয়ী না হই, অপমানের উত্তর না দিতে পারি, তাহলে জীবনকে শেষ করে দেওয়াই বাঁচার একমাত্র উপায়।

সেই প্রতিজ্ঞা নিয়ে কালভে গান শুরু করলেন মিলানে—যেখানে তাঁকে হিস্‌-হিস করে একদিন তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

মিলানে গাইতে যাবার আগে নেপলস্‌-সহ ইতালির নানা জায়গায় সাফল্যের সঙ্গে গান গেয়েছেন। মাদাম লাবর্দ-এর শিক্ষায় এবং জীবনের শিক্ষায় সমৃদ্ধ কালভের প্রতিভা বিকশিত হতে শুরু করেছে। বিখ্যাত টেনর ভিক্তর মোরেলের সঙ্গে হ্যামলেটে অংশ নিয়েছেন ওফেলিয়ারূপে। পেশ্যর দ্য পের্ল-তে প্রতিভাবান টেনর লুসিয়ার সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছেন সোপ্রানো-রূপে। প্রশংসার তরঙ্গ উঠেছে, কিন্তু কালভে অতৃপ্ত অশান্ত থেকেছেন অন্তরে। জয়—জয় চাই সেখানে, যেখানে পতাকা লুটিয়ে চলে আসতে হয়েছে। সমাধির উপরে তুলতে হবে জয়স্তম্ভ, একমাত্র তাতেই তৃপ্ত হবে আত্মা।

মিলানের দর্শকদের কথা ভাবলে আতঙ্ক হয়। এমন অশিষ্ট অভদ্র রূঢ় দর্শক যে-কোনো শিল্পীর রক্তপান করতে পারে।

দারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে কালভে মিলানের মঞ্চে উঠলেন ওফেলিয়া গাইতে। ওঠার আগে ভেবে নিয়েছেন—আজ জীবনের চরম পরীক্ষা। হয় বা নয়।

প্রথম অঙ্কের গান শেষ হল। দর্শকের করতালি নেই। শীতল বিরূপ প্রেক্ষাগার।

কালভে হাঁপাতে লাগলেন। এখন মরীয়া তিনি। পাদপ্রদীপের আলো কে যেন শুষে নিয়েছে। কালি-লেপা মঞ্চ। অন্ধকার শুধু অন্ধকার। ঠক্‌ঠক্‌ করে দাঁতে দাঁত বাজতে লাগল। "যদি সফল না হতে পারি", ওফেলিয়ার উন্মাদ-দৃশ্যে অবতরণের আগে কালভে তাঁর মাকে বললেন, "তাহলে জানলা দিয়ে ঝাঁপ দেব।"

উন্মাদিনী ওফেলিয়ার অভিনেত্রী এখন স্বয়ং অর্ধোন্মাদ। বেপরোয়া হয়ে মঞ্চে ছুটে ঢুকলেন, কোনো মেক-আপ নেন নি, সাজের দিকে দৃষ্টি ছিল না, সেই মনই ছিল না, রক্তশূন্য মুখ, কণ্ঠে বিকৃত আর

রোষে আরক্ত—

দেখেই দর্শক নড়েচড়ে বসে। এ কে? কী অদ্ভুত, কী সত্য, কী দারুণ বাস্তব এই আবির্ভাব। তারা ভাবল, এই বিপর্যস্ত বেশ, উদ্‌ভ্রান্ত রূপ—এ নিশ্চয় যত্নে রচিত। আহা-হা-হা। সমর্থন ও অনুরোগের তরঙ্গ বয়ে গেল। আর কালভে গলা ছেড়ে দিলেন, উন্মত্ত ট্রাজিক সুর আছড়াতে লাগল। প্রথম ছত্র গীত হওয়া মাত্র উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন। এই শুরু। আঘাত করো, আরও আঘাত করো। পূর্ণ বিজয় চাই। কালভে পাগল বাসনায় এমন একটি ক্যাডেনজা ধরে নিলেন, যার উপরে চড়ে থাকা নিতান্ত কঠিন। খাদে 'এ' থেকে 'এফ'-এ উঠে সমুচ্চ 'সি' পর্যন্ত ধেয়ে যাওয়া। সেই শিখরে উঠবার পরে সমস্ত চেতনা দুলতে থাকে। সে এমন এক জগৎ যেখানে অশরীরী আচ্ছন্নতার প্রবাহ—সেখানে ওঠা যায়, নামা যায় না।

অবস্থা দেখে সঙ্গীত-পরিচালক আতঙ্কিত—পরিণতি কি হবে? কালভে যতক্ষণ পারলেন সেই সুরকে ধরে রাখলেন, কিন্তু আর পারছেন না, বুক বিস্ফারিত করে শ্বাস টেনেও ওখানে থাকা যাচ্ছে না, এখনি সর্বনাশ হবে, আবার দর্শকের উপেক্ষার নিশ্বাস-ঝড়ে তচ্‌নচ্‌ হয়ে যাবে ক্ষণস্বর্গের মোহজীবন—না—তা হতে দেব না—হে ঈশ্বর রক্ষা করো! অসীম শক্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণ করে কালভে নামতে থাকেন ক্রোমাটিক স্কেলে—আর আহা, নামলেন যে-লীলায়িত গতিতে, স্বর্গ-গঙ্গার মর্ত্যাবতরণের মতো করুণাতরঙ্গে, তাতে আলোড়িত হয়ে উঠল সমস্ত দর্শকের বুক, যারা এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে অসম্ভব কাণ্ড দেখছিল। তার পরেই দর্শকের করতলে বাজতে লাগল দুন্দুভি—জয় জয় জয় রে—।

কালভে বাতাসে ভাসমান। "এহেন মুহূর্তে আমি যেন অপার্থিব কেউ, অলৌকিক। এখন আমি একক নই—অগণিত। বিকীর্ণ আলোক আমি, স্বয়ং আলোক। ব্যক্তিচেতনা লুপ্ত, বিশাল ইচ্ছাপ্রবাহে ভাসমান। তার বন্যাতরঙ্গ আছড়ে-আছড়ে বলছে—দাও! দাও! দাও!"



চতুর্থ স্বরের সাধিকা

অরণ্যে আগুন—জ্বলছে পৃথিবীর বুক—কিন্তু আলো ছড়িয়েছে নিশীথ আকাশে। সেই হল শিল্পীর, মহৎ শিল্পীর জীবন, যে চায় নিজেকে পুড়িয়ে আলো ছড়াতে. মাটিতে পা গেঁথে ঊর্ধ্বমুখী হতে। লৌকিক গৃহাঙ্গনে অলৌকিকের আরতি তার।

সুরের জগতে অলৌকিকের দর্শন চান কালভে, তিনি জন্ম হইতেই সুরের জন্য বলিপ্রদত্ত। সেই অলৌকিককে পেলেন রোমে গিয়ে।

রোমে গিয়েছিলেন মাসকানি-র লামিকো ফ্রিৎস অপেরার সুজেল-এর ভূমিকায় অংশ নিতে। সেকালের দুই জনপ্রিয় গায়ক—লুসিয়া, টেনর-রূপে এবং লেরি, ব্যারিটোন-রূপে, কালভের সঙ্গে গাইলেন। ত্রয়ীর প্রতিভায় অসামান্য সাফল্য লাভ করল অপেরাটি।

গির্জা-সঙ্গীতের প্রকৃষ্ট রূপ দেখতে কালভে সিস্টিন-চ্যাপেলে গেলেন। সেখানে সেই মানুষটির সাক্ষাৎ পেলেন যিনি সত্যই অপার্থিবকে নামিয়ে আনেন কণ্ঠে—শেষ খোজা তুর্কী মুস্তাফা।

আত্মহারা হয়ে কালভে তাঁর গান শুনলেন।

"মুস্তাফার কণ্ঠে এমন-কিছু বিচিত্র স্বর খেলে যাকে তিনি 'চতুর্থ স্বর' বলেন—অপূর্ব অদ্ভুত—না-নারী, না-পুরুষ, যথার্থ কিন্নরকণ্ঠ—সূক্ষ্ম, সুগভীর, তীব্র শিহরিত, অনুরণিত, অতিলৌকিক, রহস্যময়।"

ঐ 'চতুর্থ স্বর' আমার চাই।

কালভে মুস্তাফার কাছে আবেদন জানালেন, "আমি শিক্ষার্থী বলুন, কি করে ঐ স্বর্গীয় সুর শিখতে পারি ?"

মুস্তাফা : "খুব সহজ। প্রতিদিন সকালে ঘণ্টা-দুই মুখ একেবারে বন্ধ করে গলা সাধতে হবে। দশ বছরের শেষে কিছুটা পেয়ে যাবে।"

"অবশ্যই খুব সহজ, খুবই সহজ"—কালভে আনন্দে আঁতকে উঠে বললেন—"সহস্র ধন্যবাদ।"

কালভে কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নন। সত্যই তিনি মুখ বন্ধ করে গলা সাধতে শুরু করলেন। তাঁর মা সেই সাধন-সঙ্গীত শুনে চমৎকৃত হয়ে গেলেন—"আহা, কি অপূর্ব ঐ অসুস্থ বেড়ালের মিঁয়াও মিঁয়াও!" দু' বছরের শেষে কালভে কিন্তু সত্যই ও-বস্তু কিছুটা পেয়ে গেলেন—পুরো পেলেন তিন বছর চেষ্টা করে।

মুস্তাফার চতুর্থ স্বরকে কালভের বন্ধু-বান্ধবেরা 'ধাপ্পাবাজি' বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। মুস্তাফা সে কথা শুনে বলেন, "ওদের ঘেউ-ঘেউ করতে দাও। যদি আমরা কিছু পেয়ে থাকি, তাকে আমাদের বন্ধুরা 'ধাপ্পাবাজি' বলে যাবেন যতক্ষণ-না সে জিনিস তাঁরা পাচ্ছেন। আর যেমনি তা পাবেন, অমনি ভাষা বদলে গিয়ে ওটা 'প্রতিভা' হয়ে দাঁড়াবে।"

কালভের অনন্ত ধৈর্য, তাই তিনি চতুর্থ স্বরকে পেয়েছিলেন। মহান কিছু লাভ করার জন্য উপযুক্ত মূল্য তিনি দিতে পারতেন।

"যখন আমার বয়স কম ছিল তখন আগুনের উপর দিয়েও হেঁটে যেতে পারতাম যদি কেউ বলত ও-কাজ করলে আমি আরও ভালো

গাইতে বা অভিনয় করতে পারব।”

তিনি আগুনে হাঁটেন নি, কিন্তু জলে ডুবেছিলেন আর্টের প্রয়োজনে।

বিখ্যাত ভাস্কর হ্যনি পিউশ্‌ কালভেকে বলেন, তিনি তাঁর মডেলদের দেহরেখা ভালোভাবে ফোটাবার জন্য পোশাক জলে ভিজিয়ে পরতে দেন। সেই শিক্ষা শিরোধার্য করে কালভে ওফেলিয়ার উন্মাদ-দৃশ্যে অবতরণের আগে কাপড়-চোপড় জলে ভিজিয়ে নিলেন।

এবং—অপূর্ব অভিনয়ের পুরস্কার পেলেন প্রচণ্ড সর্দিকাশি।



একটি ক্ষুদ্র নাটক

একের পর এক ইউরোপের শিল্পতীর্থগুলিতে কালভের জয়ধ্বনি উঠতে লাগল। রোমের পরে ভেনিস। স্বপ্ননগরী ভেনিস রাজহংসের মতো ভাসছে জলের উপরে। সেখানে অষ্টাদশ শতকের এক মনোহারী প্রেক্ষাগার, থিয়েটার ড্য ফেনিস-এ ওফেলিয়ার ভূমিকায় কুড়িবার অবতীর্ণ হলেন। জয় করে নিলেন দর্শকদের—তাদের হৃদয়রাণী তিনি।

মনোরম একটি নাটক ঘটে গেল এখানেই।

একদিন নির্ধারিত সময়ের একটু আগেই কালভে থিয়েটারে গেছেন। মঞ্চে উঠে দেখেন, উইংসের ধারে মাথা-খোলা পাল্কির মতো একটি সুন্দর চেয়ারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে একদল কুলি ও মিস্ত্রি।

কালভেকে দেখে স্টেজ-ম্যানেজার এগিয়ে এলেন।

ম্যানেজোর বিনীতভাবে বললেন,"মাদাম, জানাবেন কি, আপনার ওজন কত ?"

সবিস্ময়ে কালভে উত্তর দিলেন, "কেন, একশো পঁচিশ পাউণ্ড !"

"চমৎকার ! চমৎকার !" ম্যানেজার উল্লসিত, "একেবারে ঠিক-ঠিক। একটু বেশি হলে চলত না। মাদাম, ওটি হল পাত্তির চেয়ার। পাত্তি ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে খাল দিয়ে গণ্ডোলায় চড়ে যেতেন না। তাই তাঁকে পথ দিয়ে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই পাল্কিটি তৈরি করানো হয়েছিল। মাদাম ইচ্ছে করলে ওটি ব্যবহার করতে পারেন। মাদামের ওজন একটু বেশি হলে বেয়ারারা বয়ে নিয়ে যেতে পারত না।"

পাত্তি—আদেলিন পাত্তি—তাঁর চেয়ার—তাতে বসে যাওয়া যাবে—আঃ কি সৌভাগ্য ! কালভে তৎক্ষণাৎ রাজি।

আদেলিন পাত্তি—কালভের স্বপ্নের রাণী। কৈশোর-স্মৃতির মধ্যে কালভে ফিরে যান, যখন মায়ের সঙ্গে দীর্ঘকাল লাইনে দাঁড়িয়ে কম দামের টিকিট কাটতেন পাত্তির গান শুনবার জন্য। শতাব্দীর সেরা গায়িকাদের একজন তিনি, মাদ্রিদে জন্ম, কমেডিতে অপরাজেয়, অম্লান বিশুদ্ধ কণ্ঠস্বর, পৃথিবীর মাটিকে যেন স্পর্শ করে না। যেন কোনো রূপকথার অপ্সরা-শিশু পুতুল খেলছিলেন স্বর্গীয় উদ্যানে, হঠাৎ স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে নেমে এসেছেন—

পাত্তি সত্যই সারাক্ষণ নিজের মনে পুতুল খেলেন। বাল্যেই তাঁর সঙ্গীতজগতে অবতরণ। পুতুলগুলি কেড়ে নিয়ে তাঁকে স্টেজে পাঠাতে হত—গান-শেষে আবার পুতুল ফেরত পেতেন। পাত্তি তাদের নিয়ে

মগ্ন থাকতেন—মগ্ন থাকতেন নিজের হাসিতে খুশিতে, সুখে সৌন্দর্যে—মিশতেন না কারো সঙ্গে, এমন কি খেয়ালও করতেন না—কে গাইছে তাঁর সঙ্গে, কী গাইছে সে ? একবার তাঁকে পূর্বরাত্রের সহ-গায়ক সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে পাত্তি বলেন, "আমি ঠিক খেয়াল করে দেখি নি তিনি কেমন গেয়েছেন। তবে নিশ্চয় ভালো, কেননা মন্দ বলে তো মনে হয় নি।"

পাত্তি রিহার্সালে যেতেন না—অযথা পরিশ্রমে গলার 'রেশমী চিকনতা' নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে। যেদিন গাইতেন সেদিন কোনো-কিছু পড়তেন না, তার কারণ, তাঁর স্বামী ব্যাখ্যা করেছিলেন, "কণ্ঠের পেশীগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে যে-সব সূক্ষ্ম স্নায়ু, তারা সংকুচিত প্রসারিত হয়ে চঞ্চল হয়ে পড়বে—চোখ দিয়ে কিছু পড়লে।"

এসব দিক দিয়ে পাত্তির সঙ্গে কালভের কোনোই মিল নেই। কালভে ঘড়ি ধরে রিহার্সালে উপস্থিত থাকেন, এবং গাইবার দিন বই পড়েন বাধ্যতামূলক বিশ্রাম পাবেন বলে। কিন্তু পাত্তি—

"যাদুকরী, যাঁর কণ্ঠস্বরের তুলনা নেই। মোহন আকর্ষণীয়তায়, ত্রুটিহীন নৈপুণ্যে তাঁকে দিব্য মনে হত। তাঁর স্বর—সে জিনিস হয় নি, হয় না। বিচ্ছুরিতদ্যুতি অপূর্ব এক মুক্তামাল্যের মতো তা, অদ্ভুত সামঞ্জস্যে গ্রথিত, প্রতিটি মাণিক্য নিখুঁত সুন্দর, আকারে ও বর্ণে সমরূপ।"

এহেন পাত্তির দোলায় কালভে চড়ে বসলেন, পুরনো ভেনিসের আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে তাঁকে বয়ে নিয়ে চলল বাহকেরা। দারুণ সজ্জিত দোলাটি, দেখলেই নজর টানে। রোজ একই পথে যাতায়াত, তাই পথের সবাই তাঁকে চিনে গেল। নগরিয়া ছাওয়ালেরা দোলা দেখলেই চেঁচায় ঃ

একো লা প্রিমা ডন্না ! এ ভিভা ! এ ভিভা !
ছাখো ছাখো সঙ্গীতরাণী ! জীয়ো ! জীয়ো !

অনবদ্য হয়েছিল থিয়েটারে কালভের শেষদিনের সংবর্ধনা। ফুলে-ফুলে ভরা মঞ্চ। অভিনন্দনের উচ্ছ্বাস, জয়ধ্বনির উত্তালতা।

পালা চুকবার পরে কালভের মা তাঁদের খাস-দাসী ভালেরিকে পাঠালেন বাহকদের ডেকে আনবার জন্য। ভালেরি প্যারিসের মেয়ে। মেয়েটি বেশ, ছিমছাম সুন্দর, অনেকটা কালভের মতো দেখতে, তাঁর মতোই সাজ-পোশাক করতে ভালোবাসে। মেয়েটি কাজেরও বটে।

সেদিন কি হল, সে আর ফেরে না। অনেকক্ষণ বসে-বসে কালভে ও তাঁর মা বিরক্ত। ভয়ানক ধকল গেছে, কোথায় ঘরে ফিরে বিশ্রাম করবেন, তা নয়, আজকেই দেরি! কি হল ভালেরির, গেলই বা কোথায় মেয়েটা—

হঠাৎ ড্রেসিংরুমের মধ্যে ধেয়ে ঢুকল সে।

"মাদ্‌মোয়াজেল, আমাকে ক্ষমা করুন," ভালেরি হাঁপাচ্ছে, "আমি ইচ্ছে করে দেরি করি নি। ওরা আমাকে দোলায় বসিয়ে বয়ে নিয়ে গেছল। ওরা—দরুণ সাজ-পোশাক পরা ভদ্রলোকেরা—প্রণয়গান গাইতে-গাইতে সঙ্গে গেল। উঃ কি দারুণ ব্যাপার। এক্কেবারে জয়-যাত্রা। ওরা আমাকে ভেবেছিল—আপনি আপনি!"

দম ছুটে যাওয়ার জন্য ভালেরি থামল। কিন্তু এঁরা কিছু বলার আগেই আবার উচ্ছ্বসিত ঃ

"হোটেলে যখন গেলাম তখন কী কাণ্ড! ম্যানেজার দরজা খুলে, একেবারে কোমর বাঁকিয়ে মাথা নামিয়ে ঝুঁকে পড়ল। তারপর—যেমনি মাথা তুলে দেখেছে আমাকে—বাপ্‌রে কি লাফ তার! কুলি-দের ওপর রেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল—ওরে হতভাগারা, করেছিস কি! এ যে চাকরানিটা! আমার কিন্তু এ-ব্যাপারে কোনো দোষ নেই মাদ্‌মোয়াজেল।"

তারপরেই ভালেরি গাঢ় সুখের গলায় আনমনে বলে ঃ "আমি কি করব, আমাকে যদি মাদ্‌মোয়াজেলের মতো দেখতে হয়···আমি কি

করব…”

কালভের মা রেগে আগুন, তখনি দাসীকে বরখাস্ত করতে যান আর কি ! কালভে বাধা দিলেন। জীবনের এই নাটকটিকেও অন্য অনেক নাটকের মতো তিনি উপভোগ করতে চান। ভাবলেন, তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত রাশি-রাশি ফুলমালায় ছ' মুঠো ফুল কম হলেও তাঁর ক্ষতি নেই, কিন্তু ঐ মেয়েটি তো তার দ্বারা পেয়ে গেল আবুহোসেনের একটি রাত্রিকে। একটি দিনের পূর্ণতার স্বাদ, কে জানে, ভরে দেয় কত অচরিতার্থ বাসনার শূন্যতাকে !

জানলা দিয়ে কালভে বাইরে তাকালেন। জনহীন পথ দিয়ে বিনা অভিনন্দনে তিনি নিঃশব্দে বাহিত হয়ে এসেছেন হোটেলে। দাঁড়িয়ে আছেন ঘরের জানলায়। রাত্রি গভীর। অপূর্ব রাত্রি। রূপার পাতের মতো সমুদ্র-হ্রদের জলরাশি। অগণিত নৌকা, সব এখন নোঙর ফেলে স্থির, কোনো এক মহাশিল্পী গাঢ় সৌন্দর্যবর্ণের প্রলেপ দিয়েছে জলে স্থলে আকাশে—কালভে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

নাটকের পুচ্ছে আর একটি হুল ছিল।

পরদিন সকালে কালভের মায়ের হাতে ২০০ ফ্রাঁ-র একটি বিল ধরিয়ে দেওয়া হল—দোলা বয়ে আনা ও অভিনন্দন-আয়োজনের জন্য।

ম্যানেজারকে ডেকে পাঠিয়ে কালভের মা চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—“এর মানে কি ?”

বিব্রত ম্যানেজার আমতা-আমতা করে বোঝাতে চেষ্টা করেন, “ব্যাপার হল কি, পাত্তির ম্যানেজার এই ধরনের বিজয়োৎসবের দিনে বাহকরূপে ভাড়া করতেন মঞ্চের বাদক ও অন্যান্য কর্মচারীদের। আমি ভেবেছিলাম মাদ্‌মোয়াজেলও হয়ত তাই পছন্দ করবেন। এখন যদি—”

কালভের মা ছ' হাতে মাথা চেপে বসে পড়লেন, “উঃ অসহ্য। দুশো ফ্রাঁ আমাকে দিতে হবে একটা চাকরানির গৌরববৃদ্ধির জন্য !”



সুরের দান—জীবন

কালভের ভেনিসের জীবন অবিরাম সাফল্যের জীবন। রূপাকাঙ্ক্ষী-দের কল্পলোক, কামনার মোক্ষধাম, রসানন্দময়ী ভেনিস—ফুলমাল্যে তাঁকে বরণ করেছে। কালভে উঠে পড়েছেন উচ্চে—অনেক উচ্চে।

তারপর ?

নামিল আঘাত।

মঞ্চের জীবনই একমাত্র জীবন নয়। মঞ্চ বা সাজঘর—তারা তো শয়নঘর নয়। অগণিত দর্শকের তৃষিত চোখের সামনে মঞ্চে যে নিজেকে ঢেলে দেয়, সে ঘরে ফিরে একান্তে নিজেকে দিতে চায় এক-জনকেই। প্রেম—সেটা অভিনয়, মঞ্চে। প্রেম—সেটা রক্তসত্য, গৃহে।

ওফেলিয়া প্রতীক্ষা করে আছেন হ্যামলেটের একটি চিঠির জন্য কতদিন। সেই চিঠিতে আসবে স্বর্গ—যা আমার শোণিত-মজ্জায় নির্মিত।

সে চিঠি এলো। বজ্রের মতো চূর্ণ করে দিল কালভেকে—প্রচণ্ড 'না'

শব্দে। বর্বর, নিষ্ঠুর ক্রূর—সে পত্র। তাতে করাল অক্ষরে লেখা আছে —আশার মৃত্যু, সুখের সমাধি।

আলো মুছে গেল।

"কুসুমদাম-সজ্জিত দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী। কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি ;
নীরব রবাব বীণা—"

কালভের সমস্ত সত্তা আর্তনাদ করে বলে : "তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে।"

"মৃত্যু—তাই চাই। ব্যালকনি থেকে ঝুঁকে দেখি—নীচে কালোজল, ছলছল ছলছল। এখন চাই শুধু একটু মনের জোর, সামান্য চেষ্টা—তাই এনে দেবে বাঞ্ছিত শান্তি। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন আমি, যাতনায় নিষ্পেষিত, তাকিয়ে আছি নিম্নে, যেখানে গুহাগর্ভের জমাট অন্ধকার। ঝাঁপ দাও। কিন্তু তখনো বধির হয়নি আমার গানের কান। নৈরাশ্যের আচ্ছাদন ভেদ করে ভেসে এলো সুর—মাঝি গান গাইছে দাঁড় বাইতে-বাইতে।

"আঃ গান! গান! হাঁ—মৃত্যুর আগে অন্তত একবার। একবার অন্তত রাত্রির কাছে নিবেদন করব আমার বুকের যন্ত্রণাকে গানের সুরে—অনন্ত নীরবতা আমাকে চিরতরে ঢেকে ফেলার আগে।

"উন্মত্তের মতো ঢিলে পোশাক গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দরজার বাইরে পাথরের সিঁড়ির একপাশে একটি নৌকা বাঁধা—তার উপরে কখন উঠে পড়েছি জানি না। সেটি নিয়ে ভেসে গেছি স্থির জলের উপর দিয়ে—তলায় কালো জল, উপরে আরও কালো আকাশ। তখন আমি গাইতে শুরু করলাম পাগলের মতো—যত গান জানতাম—আনন্দের বিষাদের পূর্ণতার শূন্যতার—গান শুধু গান। আমার

কণ্ঠ থেকে বন্যার মতো আছড়ে পড়তে লাগল আমার অগ্নিগলিত হৃদয়। আমি গাইলাম—আর কোনো দিন গাইব না সেই আবেগে গাইলাম—নিঃশেষে ঢেলে দিলাম আমার শক্তি, আমার শোক, আমার প্রাণ, আমার জীবন। নিশ্চুপ ছায়ারা চারিদিকে, নিরুত্তর। তাদের কাছে উজাড় করে দিলাম সৌন্দর্য ও শিল্পের যতকিছু সঞ্চয় সবই।

"অবশেষে যখন আমার কণ্ঠ মূর্ছিত হয়ে পড়েছে শক্তি হারিয়ে, শুষ্ক ওষ্ঠ শব্দমাত্র উচ্চারণ করতে পারছে না—তখনই বুঝলাম কি বিচিত্র পরিস্থিতি। জ্বর ও প্রলাপের আচ্ছন্ন জগৎ থেকে মানুষ যেমন বড়ো যন্ত্রণায় চোখ মেলে দেখে বাস্তব পৃথিবীকে, তেমনিভাবে চোখ মেললাম, আর দেখলাম—কি করেছি!

"আমার চারপাশে নৌকার পর নৌকা, রাশিরাশি নৌকা, ঠেলাঠেলি ঠোকাঠোকি—ভৌতিক জাহাজের মতো তারা সবদিক থেকে এসে জুটেছে—বিস্ময় গুঞ্জনে-ভরা মানুষে ভর্তি। আমার নৌকার একেবারে গায়ে একটি নৌকা, তাতে এক তরুণ দম্পতি, ঘন আলিঙ্গনে বাঁধা, পরমাশ্চর্যে বিদ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। আমি জানি না, আমার কণ্ঠ-স্বর কতক্ষণ ধরে মধ্যরাত্রির এই ছায়াশরীরী শোভাযাত্রাকে আমার কাছে টেনে এনেছে।"

মরণসাগরে ঝাঁপ দেওয়া হল না। অজস্র বিস্মিত অক্ষিতারকার অভি-নন্দন থেকে পালিয়ে বাঁচবার জন্য কালভে একটি যাত্রীহীন নৌকার ছইয়ের মধ্যে ঢুকে গেলেন, তারপর ভিড় সরে গেলে অনেক্ষণ পরে নির্জন এক জায়গায় নেমে হোটেলের পথ ধরলেন। তখনো মনে হল, তিনি নিঃসঙ্গ নন, একটি ছায়া তাঁকে অনুসরণ করছে।

পরদিন সকালে ভৃত্যের মারফত একগুচ্ছ ফুল এবং একটি চিঠি পেলেন:

"পল ও জেনীর কাছ থেকে : যারা পরস্পরকে নিবিড়ভাবে ভালোবাসে। তাদের আপনি এক অবিস্মরণীয় রাত্রি উপহার দিয়েছেন। ঈশ্বরাগ্নির বাহিকা আপনি—আপনার উপরে বর্ষিত হোক ঈশ্বরের অনন্ত আশীর্বাদ।"

"শেষের কথাগুলি আমার গভীরতম তন্ত্রীকে স্পর্শ করল, আমার আত্মাকে জাগিয়ে তুলল, অবশেষে আমি প্রার্থনা করতে পারলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম—বেঁচে আছি বলে।"

"আমার গান বাঁচাল আমাকে।"



বক্ষোমাঝে নাচে রক্তধারা

নিঃশব্দ বিশাল হা-হা হাসিতে ছেয়ে গেল কালভের মনের আকাশ। ভাগ্যের পরিহাস—না-কি ভাগ্যের আশীর্বাদ! একজনের ব্যর্থপ্রেমের মৃত্যুসঙ্গীত অন্য দুই জনের সার্থক প্রেমকে দান করল অবিস্মরণীয় প্রহর!···এবং সেই গানই আত্মহনন থেকে রক্ষা করল ব্যর্থ প্রেমিকাকে!!

সুতরাং হে জীবন!

জীবনে প্রত্যাবর্তন করলেন কালভে।

মুক্তি চাই দুঃখ থেকে, মুক্তি চাই সুখ থেকে—মুক্তিই মন্ত্র—

বাসনা যদি আসে, কণ্ঠালিঙ্গন করো তার। আর সে যদি জড়িয়ে বাঁধতে চায় তোমাকে—ছুঁড়ে ফেলে দাও তার লোলুপ হাত। আমার বাসনা বাধাবন্ধহীন—দায়িত্বহীন—দুঃসাহসী—

কালভে কার্মেন-রূপে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। মুহূর্তে পাগল হয়ে গেল দর্শক—তাদের জয়ধ্বনির ভিতর থেকে জেগে উঠল অপরূপ এক কালপ্রতিমা—যার নাম খ্যাতি।

সর্বোত্তম ফরাসি সুরকারদের অন্যতম জর্জ বিজে (১৮৩৮-৭৫)—মোৎসার্ট ও রয়সিনির ধারাপথে এসেও যিনি তাঁর লাবণ্যময় ভঙ্গির সঙ্গে অনবদ্যভাবে মিশিয়েছিলেন বাস্তবতাকে—তাঁর শেষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কার্মেন—প্রস্‌পার মেরিমে-র কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত। যেসব আবেগ মানুষকে মূলভ্রষ্ট করে দেয়, তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিজে-র রচনায় আসত, বিশেষত জ্বালাময় ঈর্ষা, কার্মেনে যার প্রভূত সঞ্চার।

নিখুঁত অপেরার নাম করতে গিয়ে জর্জ মার্টিন তাঁর 'অপেরা কম্পানিয়ন' গ্রন্থে তিন শ্রেষ্ঠের উল্লেখ করেছেন—কার্মেন, আইজ, ডন্ জ্যোভানি। কার্মেন-প্রসঙ্গে বলেছেন—"এই অপেরাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসাধারণ। অনেকেই ১৮৭৫ সালে একে ভাগ্‌নারের উপযুক্ত উত্তররূপে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, এবং এর পক্ষে প্রচণ্ড সমর্থন জানিয়েছিলেন, নীট্‌শে।" আর্নেস্ট নিউম্যানের একটি মন্তব্য মার্টিন উদ্ধার করেছেন: "কার্মেন, মোৎসার্টের পরে সর্বাধিক মোৎসার্টীয় অপেরা। এতে মোহিনী সুরতরঙ্গের পাশাপাশি একটানা চলেছে নাটকীয় বস্তুনিষ্ঠা এবং মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রায়ণ।" ডেভিড ইউয়েন 'এনসাই-

ক্লোপিডিয়া অব মিউজিক্যাল মাস্টারপিসেস্'-এর মধ্যে জানিয়েছেন, নীট্শে কুড়িবার এই অপেরা দেখেন। নীট্শের মতে, "একে অপেরার মাস্টারপিসদের অন্যতম বলা যায়।" ইউয়েনের মতে, "বিজে-র বিরাট খ্যাতি প্রধানত দাঁড়িয়ে আছে এই অপেরার উপর। তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভার পূর্ণবিকাশ এখানে হয়েছে। এতে বিজে দিয়েছিলেন অপূর্ব সুরসঙ্গতির ঐশ্বর্য, অসাধারণ যন্ত্রসঙ্গীতবোধ, পরিবেশবর্ণ রূপায়ণের অসামান্য ক্ষমতা এবং সুন্দর নাটকীয় প্রতিভার অনপনেয় স্বাক্ষর। এই অপেরাটির দ্বারাই বিজে মহান সুরস্রষ্টার সম্মান পেয়েছেন।" ইউয়েন এই প্রসঙ্গে ডি সি পার্কারের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, যিনি এটিকে অপেরা-জগতে অনন্যসাধরণ সৃষ্টি মনে করেন, একেবারে তুলনা-রহিত, যা কোনো সন্দেহ না রেখে বিজে-র সর্বোত্তম রচনা।

স্পেনের জিপসিদের কাহিনী এই অপেরায় বর্ণিত বলে বিজে এর মধ্যে বাস্তব জীবনরসের প্রয়োজনে যথেষ্ট স্পেনীয় লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের সুর ও ছন্দ দিয়েছেন। তাহলেও এটি খাঁটি ফরাসি অপেরা। প্রসপার মেরিমে-র মূল গল্পে কার্মেনের যে-চরিত্র, তাকে অনেক শোধিত করে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। মূল গল্পে কার্মেন সামান্য তস্করনারী—এই অপেরায় গ্ল্যামারাস নায়িকা।

বিজে-র এই সর্বোত্তম সৃষ্টি কিন্তু তাঁকে আঘাত ছাড়া আর কিছু দেয়নি। ১৮৭৫, ৩ মার্চ প্যারিসের অপেরা কমিক-এ এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়—কার্মেনের ভূমিকায় নামেন গাল্লি মারিয়ে। প্যারিসের দর্শক কিন্তু একে একেবারে পছন্দ করে নি। স্টেজে মেয়েরা প্রকাশ্যে ধূমপান করছে—দেখে তো অভিজাত মহিলারা প্রায় মূর্ছিত। কার্মেনের অতি বাস্তবতা দর্শকদের রসরুচিকে আহত করেছিল প্রচণ্ডভাবে। কঠোর সমালোচনা করা হয় সংবাদপত্রে। অনেকে বলেন, সেই আঘাত বিজে-র মৃত্যুর কারণ। সেকথা সবাই স্বীকার করেন না, বিজে-র ভগ্ন-স্বাস্থ্য এবং কষ্টের অন্য কারণের উল্লেখ তাঁরা করেন—তাহলেও কেউই

কার্মেনের ব্যাপারে তাঁর দারুণ নৈরাশ্য ও মনোভঙ্গের কথা অস্বীকার করেন নি। এখানে বিচিত্র অথচ শিল্পীদের ক্ষেত্রে পরিচিত ব্যাপারটির দৃষ্টান্ত পাই—যে-বস্তু পরে ধন্যধ্বনি জাগাবে, তার ব্যর্থতার দুঃখকে বহন করে স্রষ্টাকে বিদায় নিতে হয়েছে। প্যারিসে দর্শকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত কার্মেন কুড়ি বছরের মধ্যে হয়ে দাঁড়াবে পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় অপেরা।

কার্মেন যেমন শ্রেষ্ঠ ফরাসি সুরকার বিজে-র শ্রেষ্ঠ রচনা, তেমনি ঐকালের শ্রেষ্ঠ ফরাসি সোপ্রানো কালভের সর্বোত্তম ভূমিকাও তাই। ইতিহাসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিজে ও কালভে পরস্পরের পরিপূরক। বিজে সেই সুর সৃষ্টি করেছিলেন যা কালভের দক্ষিণ ফ্রান্সের তপ্ত রক্তকে মাতাল করেছিল। সেই রক্তকোলাহলের জয়ধ্বনি তুলে কালভে, ব্যর্থ-সৃষ্টির বেদনা নিয়ে লোকান্তরিত সুরস্রষ্টাকে নমস্কার জানিয়েছিলেন।

অপেরা-রূপে কার্মেন-এর একটি দোষের কথা সমালোচকেরা বলেন—এটি কার্যত এক চরিত্রের অপেরা। কার্মেনকে বাদ দিলে এর প্রায় আর কিছু থাকে না। কার্মেন-এর এই দোষকে কালভে গুণের কারণ দাঁড় করিয়েছিলেন নিজের প্রতিভায়। তিনি গোটা অপেরাটিকে গ্রাস করে নিজেকে ব্যক্ত করেছিলেন। এক মহাশিল্পীর পরিপূর্ণ আত্ম-বিকাশের ক্ষেত্র হয়েছিল বলেই কার্মেন-এর ঐ সাফল্য।

কালভের কণ্ঠ বহুদিন নীরব হয়ে যাওয়ার পরেও সঙ্গীতের ইতিহাসে, সাধারণ এনসাইক্লোপিডিয়া প্রভৃতিতেও, গায়িকারূপে কালভের অন্যান্য সাফল্যের উল্লেখ করেও কার্মেন ভূমিকার সঙ্গেই তাঁর নামকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র মতে, "দীর্ঘ-দিন ধরে কালভের সঙ্গীতাভিনয়কেই কার্মেনের মডেল বিবেচনা করা

হয়েছে।” ডেভিড এডিশন ‘এনসাইক্লোপিডিয়া অফ দি অপেরা’-তে বলেছেন, “কালভে, কার্মেন ভূমিকায় সর্বাধিক খ্যাতনাম্নীদের অগ্রণী। …তাঁর কালের একেবারে শীর্ষস্থানীয়া নায়িকা তিনি।” অসকার টমসন-সম্পাদিত ‘দি ইনটারন্যাশন্যাল সাইক্লোপিডিয়া অব মিউজিক অ্যাণ্ড মিউজিসিয়ানস্’-এর মধ্যে বলা আছে, “কার্মেনের গানে কালভে ইন্দ্রিয়মাদকতার মোহিনী আকর্ষণ সৃষ্টি করতেন,যা তাঁকে ধারাবাহিক দীর্ঘ সাফল্য এনে দিয়েছিল এবং জনসাধারণ তাঁকে এই ভূমিকার কালনির্ধারিত শিল্পী বলে স্বীকার করে নিয়েছিল।” কালভে কখনো-কখনো বাঁধনহারা আবেগে শিল্পের সীমারেখাকে· ভেঙে ফেলতেন, সে বিষয়ে মৃদু কটাক্ষ করার পরেও এই গ্রন্থে বলা হয়েছে, “কালভের কার্মেনে নারী-নাগিনীর আকর্ষণ—এক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়া। তা কখনো অতি বিষণ্ণ, খেয়ালী, অতি নাটকীয় কিন্তু অদ্ভুতভাবে আদিম প্রাণপ্রেরণায় উজ্জীবিত।…পরবর্তীকালে কার্মেন ও কালভে একাঙ্গ হয়ে গেছে।” গ্রোভস্, ‘ডিকসনারি অব মিউজিক অ্যাণ্ড মিউজিসিয়ানস্’-এ বলেছেন, “এ-পর্যন্ত যত গায়িকা কার্মেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কালভেই সর্বোচ্চ বলে স্বীকৃত।”

কালভে স্বয়ং বলেছেন :

“সারা পৃথিবীতে এই ভূমিকায় গান গেয়েছি। আমার যদি কিছু খ্যাতি থাকে, তা এই ভূমিকার জন্যই। আমার দীর্ঘ অপেরা-জীবনের এটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় সৃষ্টি—নিঃসন্দেহে সবচেয়ে জনপ্রিয়।”

কয়েক বছর ইতালিতে কাটাবার পর ১৮৯২ সালে কালভে আবার যখন প্যারিসে এসে অপেরা কমিক-এ যোগ দিলেন, তখন তাঁর প্রথম ভূমিকা—কাভাল্লেরিয়া রুসটিকানা-র সান্‌টুৎসা। এই ভূমিকায় তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্যের মূলে তাঁর স্বাধীনচিত্ততা। এখন তিনি বেপরোয়া।

জীবনের কঠিন আঘাত তাঁকে জীবনের সাজানো পোশাককে ছিঁড়ে ফেলার শিক্ষা দিয়েছে। নতুনভাবে সাজাবেন নিজেকে—যাতে রক্তের বর্ণ আর পোশাকের বর্ণ এক হয়ে যায়। ইতালির গ্রাম্য মেয়ে, উষ্ণ আবেগপ্রবণ সান্টুৎসা—তার পোশাক হওয়া চাই তারই মতো—তাই কালভে মোটা খস্‌খসে সার্ট, বিবর্ণ চটি, আর অদমিত ভঙ্গি নিয়ে মঞ্চে নামলেন। সবাই চমকে আপত্তি করেছিলেন, কালভের শ্রদ্ধেয় মানুষ পর্যন্ত। কিন্তু সবকিছু ঠেলে তিনি এগিয়ে গেছেন এবং স্বীকৃতি পেয়েছেন অবিলম্বে।

একই দুঃসাহসিক আবেগে তিনি উপস্থিত করলেন কার্মেনের নবরূপ। এখানেও চমকালো সকলে। কিন্তু কালভে অনমনীয়। তাঁর সিদ্ধান্ত—পোশাকে খাঁটি জিপসি হবেন—তাদের মতোই ঝালর-দেওয়া পশমী পরিচ্ছদ—আগেকার রীতিতে খাটো স্কার্ট নয়। নাচের ক্ষেত্রেও জিপসি-উদ্দামতা—হাত-পা ছুঁড়ে ছড়িয়ে মাতন—কার্মেনের আদি অভিনেত্রী গাল্লি মারিয়ে-র লাবণ্যহিল্লোল নয়।

অপেরা কমিক-এর ডিরেক্টররা তীব্র আপত্তি জানালেন। গাল্লি মারিয়ে-র অনবদ্য সৌন্দর্যচ্ছন্দে তাঁদের চোখ ভরে আছে।

কালভে বললেন, "আপনারা কি করে আশা করেন, আমি গাল্লি মারিয়ে-কে অনুকরণ করব? তাঁর ছোটখাট পরিপাটি চেহারা। আমার চেহারা তার বিপরীত। আমার মস্ত আকার, হাত-পা দীর্ঘ। এক্ষেত্রে অনুকরণ যদি কারো করতে হয়, একমাত্র জিপসিদেরই করতে পারি।"

কালভে দীর্ঘ হাত ছড়িয়ে নাচের ছন্দে দুলে উঠলেন। ডিরেক্টররা সন্তুষ্ট হলেন বা হলেন না, কিন্তু সান্টুৎসার সফল অভিনেত্রীকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না।

নতুন কার্মেন—নতুন সাজে-ছন্দে—গানে-অভিনয়ে—। প্যারিসের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল সংবাদ। কৌতূহলী হয়ে

(না-কি ঈর্ষাতুর হয়ে?) অভিনয় দেখতে এলেন তিনি, যাঁর নামের সঙ্গে এতদিন কার্মেন শব্দটি জুড়ে ছিল—কার্মেনের আদি অভিনেত্রী গাল্লি মারিয়ে। অবসর নেবার পরে এই প্রথম তিনি এই থিয়েটারে অভিনয় দেখতে এসেছেন।

গাল্লি মারিয়ে দেখলেন—তাঁর কার্মেনকে কালভে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়েছে।

অভিনয়ের শেষে কালভের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গেলেন:

"ব্রাভো কালভে! অত্যন্ত মৌলিক, অত্যন্ত মনোহারী তুমি। ব্রাভো।'

কালভে বললেন, "এই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।"

বহু বৎসর পরে, কার্মেন-এর সহস্র রজনী অভিনয়ের উৎসবে কালভে যখন আপরা কমিক-এ গান করতে যাচ্ছেন, গাল্লি মারিয়ে-র কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলেন:

"আজ রাত্রে আমার হৃদয়-মন তোমারই সঙ্গে।"

ফ্রান্সে কালভে-কার্মেন যখন রক্তে ঝড় তুলেছে, তখন ওধারে আমেরিকার সর্বপ্রধান এবং পৃথিবীর অন্যতম প্রধান অপেরা-প্রতিষ্ঠান নিউইয়র্ক মেট্রোপলিটান অপেরা হাউস দাউ-দাউ করে জ্বলছে—১৮৯২, ২৭ আগস্ট। নিউইয়র্কের কয়েকজন ধনী বণিক সেখানকার 'অ্যাকাডমি অব মিউজিক'-এ বক্স-আসন জোগাড় করতে না পারার ক্ষোভে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন ১৮৮৩ সালে। দশ বছর সচল থাকার পরে একদিন আগুন লেগে তা ধ্বংস হয়ে গেল। এক বছর হাউস বন্ধ রইল। যখন খুলল তখন দেখা গেল অঙ্গার সরিয়ে নতুন সাজে বেরিয়ে এসেছে প্রতিষ্ঠানটি। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন—ইলেকট্রিক আলো। মেট্রোপলিটান অপেরার ইতিহাসগ্রন্থে পাই: "ঝলমলে বৈদ্যুতিক

আলোক—গ্যালারির নীচে বক্সে ধনী ও অভিজাতগণের আসন—তাঁদের অঙ্গশোভিত মণিমাণিক্য তীব্র আলোকে অগণ্য বর্ণে বিকীর্ণ। সেজন্য অশ্বনালের আকারে নির্মিত অভিজাত-আসনকে আগে যেখানে বলা হত 'স্বর্ণদ্যুতি অশ্বনাল', তা এখন নতুন নাম নিয়েছে—'হীরকদ্যুতি অশ্বনাল।' দুই দিকের অর্কেস্ট্রার পাশে অর্কেস্ট্রা-সার্কল, পরস্পর মুখোমুখি, তারা দুই দিকের বক্সেরও মুখোমুখি···সেখানে আসন ভর্তি করে বসে আছে উনিশ শতকের নব্বুইয়ের দশকের স্ফূর্তি-ওড়ানো ফ্যাশানদুরস্তেরা—লাল, সোনালি ও ক্রীমরঙের নতুন পোশাকে মোড়া —মঞ্চস্থ ব্যাপারের চেয়ে কম সাজানো নয় তারা।"

নিউইয়র্কের ধনী ব্যবসায়ীরা এইটুকু জানতেন, তাঁদের অর্থ-সামর্থ্য যদি কেবল সুসজ্জিত মঞ্চ তৈরি করেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে মঞ্চ-প্রদর্শনীর প্রথম পুরস্কার পেলেও তাঁরা ব্যর্থ হবেন আসল ক্ষেত্রে।

হাঁ, প্রতিভা কিনে মঞ্চে পুঁততে হবে। ইউরোপের উদীয়মান সঙ্গীত-প্রতিভা কালভের কাছে আমন্ত্রণ গেছে তাই।

কালভে এলেন···এবং···বিদ্রোহ করলেন।

মেট্রোপলিটান অপেরায় কালভের প্রথম অবতরণ সান্টুৎসা-রূপে। কালভের ধারণা, তিনি খুব ভালো গেয়েছিলেন। দর্শকেরা তা মনে করে নি। সমালোচনার ঝড় উঠল।

ঠিক পরদিনই ডিরেক্টরদের সভা। কালভেকে ডেকে পাঠানো হল। ডিরেক্টররা সিদ্ধান্ত দিলেন—কালভেকে অবিলম্বে কার্মেন গাইতে হবে, এবং ফরাসিতে নয়—ইতালিতে।

"সে কি কথা?" কালভে সবিস্ময়ে বলেন, "বিজে-র ফরাসি-কার্মেন গাইব ইতালিতে? তা হয় না।"

রূঢ় গলায় একজন ডিরেক্টর বললেন, "কাভাল্লেরিয়া রূসটিকানা আমাদের প্রত্যাশামতো সফল হয় নি। ওটাকে এখনি বদলাতে হবে। সুতরাং এখানে তোমার কোনো কথা শোনা হচ্ছে না।"

কালভে প্রতিবাদ করেন, "কি বলছেন আপনারা? ফরাসি লেখক প্রসপার মেরিমে-র কাহিনী তা, ফরাসি সুরস্রষ্টা জর্জ বিজে তাতে সুরারোপ করেছেন, গাইছি আমি—ফরাসি। এই অপেরার স্বাদ রস, সবই এসেছে ফরাসি ভাষা ও ছন্দ থেকে—তার সবই নষ্ট হয়ে যাবে যদি একে ইতালিতে গাওয়া হয়। আপনারা কাভাল্লেরিয়াকে বদলাতে চাইছেন সাফল্য অর্জন করে নি বলে। আপনারা কি মনে করেন, সেই সাফল্য আসবে যদি আমি আমার অনভ্যস্ত সুরে ইতালীয় ভাষায় তা গাই?"

"কথা বাড়িও না। ইতালীয় কার্মেনই হবে। ফরাসিতে গাইবার মতো কোনো টেনর আমাদের নেই।"

অপূর্ব যুক্তি। ফরাসি টেনর নেই, সুতরাং ইতালিতে গাইতে হবে, হবেই—কারণ চুক্তিপণে আবদ্ধ হয়ে এসেছে শিল্পী—অর্থমূল্যে ক্রীত সে।

ক্ষোভে রোষে অস্থির কালভে কি করেন, তাঁর এক পরিচিত অভিনেতার কাছে ব্যাপারটা খুলে বললেন, "না না, এ হয় না, এ হতে পারে না—।" সে ব্যক্তির ডিরেক্টরদের উপর কিছু প্রভাব ছিল। ডিরেক্টরদের নিমরাজি করিয়ে তিনি ফরাসি টেনরের সন্ধানে বেরুলেন। সৌভাগ্যবশত জঁা দ্য রেজকে-কে রাজি করাতে পারলেন। এটা তাঁর তৈরি-করা পার্ট না হলেও উদারতাবশে সম্মত হলেন।

তারপর?

মেট্রোপলিটান অপেরার স্বর্ণযুগ আরম্ভ হয়ে গেল—২০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৩।

জিপসি-বেশে কালভে এসে দাঁড়িয়েছেন মঞ্চে। "কী ঐশ্বর্যপূর্ণ কণ্ঠস্বর, বুননে বর্ণে অসামান্য। কিবা বৈদ্যুতিক অভিব্যক্তি চরিত্রায়নের

কালে।" "কার্মেনের কালভের কণ্ঠে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব এবং তীব্র ইন্দ্রিয়-শিহরণ।" "অকল্পনীয় মধুক্ষরা কণ্ঠস্বর। কী তার মসৃণতা, আবেগে আন্দোলিত, বাসনার চাবুকে গতিশীল, একই সঙ্গে অদ্ভুতভাবে পরিশীলিত, নিয়ন্ত্রিত।"

"কার্মেন আমেরিকায় প্রথম আবির্ভাবে অবর্ণনীয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল"—পরবর্তী ইতিহাসে বলা হয়েছে।

অভিনয়শেষে দর্শকদের অভিবাদন করে বিদায় নিলেন কালভে—না, পারলেন না—ফিরতে হল—আবার—আবার। দর্শকের উন্মত্ত করতালি তাঁর উপর আছড়ে-আছড়ে পড়ে তাঁকে টেনে আনতে চাইল নিজেদের মধ্যে।

বহু বৎসর ধরে একই জিনিস চলল। "সংক্রামক রোগের মতো কার্মেন, যেখানেই গিয়েছে কেবল ছড়িয়েছে।"

দর্শকেরা কার্মেন-রূপে কেবল কালভেকেই দেখতে চায়। তাদের কাছে কার্মেন ও কালভে অভিন্ন।

স্বয়ং কালভের কাছে নয়? কে বলে? কার্মেনের সাজ পরলেই তিনি বদলে যান। কি যেন ভর করে। তখন কালভের মাও তাঁকে চিনতে পারেন না। সবিস্ময়ে বলেন, "কে তুই? তুই আমাদের অপরিচিত। তুই—তুই নোস্।"

"কার্মেন! অরণ্যের আদিম কন্যা। নিজের ক্ষুধা ছাড়া অন্য নিয়মের অস্তিত্ব মানে না।...সে নীতিহীন নয়—নীতি-বোধ-হীন। মেরুদণ্ডমূলে আছে তার জীবনভাণ্ড। মোহনীয় বন্য প্রাণী, একমাত্র আরণ্য আইনের অধীন।"



কার্মেন ! কার্মেন !

সেভিল শহরের এক সিগারেট-কারখানায় মিসালা নামে এক তরুণী এসেছে তরুণ সৈনিক ডন জোসে-র সন্ধানে। দেখা না পেয়ে চলে গেল। সিগারেট-কারখানার মেয়েগুলি তরলমতি, যুবকদের প্রেম-সঙ্গীতের উত্তর দেয় সিগারেটের ধোঁয়া ছুঁড়ে-ছুঁড়ে। যুবকেরা এদের তোয়াজ করে কিন্তু প্রতীক্ষা করে থাকে এক পরমার জন্য, তার নাম কার্মেন। সে এলো। রক্তমাতাল সুরে যুবকেরা বলল, "আমরা সবাই তোমার ক্রীতদাস। বলো, বাসবে কবে বাসবে ভালো। আমরা সবাই তোমার ক্রীতদাস।"

ইতিমধ্যে তরুণ সৈনিক জোসে এসে গেছে। তার দিকে অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করে কার্মেন বলেছে—"প্রেম সে এমন পাখি দেয় না ধরা। আর জিপসিরা যদি ভালোবাসে—সাবধান ! সাবধান !"

যুবকেরা নতজানু হয়ে কার্মেনকে বলে—"আমরা তোমার ক্রীতদাস। —ভা-লো-বা-সো !"

মিসালার ধ্যানে মগ্ন জোসে-র মুখের উপর বুক থেকে একটি ফুল নিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে হাসির তরঙ্গ তুলে কার্মেন বেরিয়ে যায়। জোসে বিরক্ত হয়। তারপর সবাই চলে গেলে ফুলটি কুড়িয়ে নিয়ে শোঁকে। মেয়েটি অসভ্য, প্রগল্‌ভ, কিন্তু ফুলটি—আঃ—দীর্ঘ শ্বাস টেনে জোসে বলে— মধুগন্ধ-ভরা কিন্তু কী তীব্র! আর, এ-জগতে মায়াবিনী বলে যদি কেউ থাকে, সে ঐ মেয়েটি—। জোসে চমকে ওঠে—কে এলো? আনন্দের হাসিতে তার মুখ ভরে যায়। মিসালা এসেছে, তার মায়ের বার্তা নিয়ে। মিসালার মারফত তার মা স্নেহচুম্বন পাঠিয়েছেন পুত্রের জন্য। মিসালার কুসুমিত ওষ্ঠে জোসের ওষ্ঠ নেমেছে—হঠাৎ শিউরে কেঁপে উঠল সে। ভাবল,ভাগ্যে মিসালা এসেছে, তাই দানবীটার কাছ থেকে রক্ষা পেয়েছি।

মিসালা চলে যাওয়ার পরে জোসে মায়ের চিঠি পড়তে-পড়তে নিজের মনে বলে, "ভয় করো না মা। তোমার পুত্র তোমারই অনুগত। মিসালাকে আমি বিয়ে করব।" তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বলে—"আর তুমি, মোহিনী শয়তানী—তোমার দেওয়া ফুলকে আমি—"

ঠিক তখনি বাইরে প্রচণ্ড চীৎকার। হুড়মুড়িয়ে ঢোকে সিগারেট-বালি-কারা ও সৈন্যদল। ঝগড়ার সময়ে কার্মেন একটি মেয়েকে আহত করে পালিয়েছে। তাকে সৈন্যরা কিছু পরে ধরে আনল। সৈন্যদের কর্তা জুনিগোর প্রশ্নের উত্তরে সে উদ্ধত স্বরে বলল: "কেটে ফেলো আর মেরে ফেলো, কইবো না-কো কইবো না···ট্রা-লা-লা-লা-লা-লা।"

জুনিগোর আদেশে কার্মেনকে পিছমোড়া করে বেঁধে জোসে নিয়ে চলল। পথে তাকে কার্মেন নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে লাগল। "আহা তুমি নিশ্চয় আমাকে জেলে নিয়ে যাবে না। কি করে তা করবে বলো, তুমি যে আমাকে ভালোবাসো। আমার ফুল তো ফেলে দিতে পারনি। তা ঢুকে গেছে তোমার মধ্যে। তাছাড়া···আমি ছেড়েছি পুরনো নাগর। চাই নতুন নাগর, চাই নতুন ভ্রমর।—আসে যায় কত জনে,

বসে আছি খোলা মনে, কে নেবে সে সিংহাসনে—বলো ?'

জোসে ধরা দিল প্রলোভনে। ফুলের যাতুকরী শক্তি তার মধ্যে সক্রিয়। তার সম্মতিতে কার্মেন পালালো। সেই অপরাধে জোসে-কে জেলে পাঠালো জুনিগো। জোসে-র প্রতি কার্মেনের পক্ষপাতে সে ছিল ঈর্ষাতুর।

এর পর দেখা গেল, স্মাগলারদের পানশালায় কার্মেন, জুনিগো প্রভৃতির সামনে সঙ্গিনীদের নিয়ে নৃত্যগীত করছে: "আমরা পাগল, বোহেমিয়ান, ঘূর্ণিঘোরে মাতন লাগে, প্রেমের আগুন-শিখা ধরে জিপসি মেয়ে শিউরে নাচে—ট্রা লা লা লা ট্রা লা লা লা।"

হঠাৎ বাইরে বিরাট কলরব—হুর্‌রে, এসকামিলো হুর্‌রে! বুল-ফাইটার এসকামিলোর সম্মানে মশাল শোভাযাত্রা। জুনিগোর আমন্ত্রণে এসকামিলো পানশালায় এসে কার্মেনকে দেখেই প্রচণ্ড আকৃষ্ট। তৎ-ক্ষণাৎ প্রণয় নিবেদন করল: "বলো তোমার নাম, যাতে পরবর্তী সর্ব-নাশের মধ্যে শ্বাস নেবার সময় পান করতে পারি মধু শব্দটিকে।"

ওধারে স্মাগলাররা বড় ধরনের দাঁও মারবার মতলব করছে। তাদের অনুরোধে কার্মেন জোসে-কে দলে টানবার প্রতিশ্রুতি দিল। কার্মেনের ইচ্ছায় জুনিগো ইতিমধ্যে জোসে-কে মুক্ত করে দিয়েছে। জোসে কার্মেনকে বলল, "তোমার জন্য কারাবাস করেছি তাতে দুঃখ নেই। তুমি আমার ঈশ্বরী।"

এই সময়ে দূরে বিউগল বাজল—সৈন্যদের শিবিরে ফেরার ডাক। জোসে ফিরে যাবার জন্য চঞ্চল হয়, আর কার্মেন ঐ বিউগলের শব্দকে অর্কেস্ট্রা ধরে নিয়ে তালে-তালে নেচে ওঠে। কিন্তু যখন সে বুঝল, জোসে ফিরে যেতে চায়, তখন নাগিনীর মতো ফুঁসে উঠল—জোসে-র হেলমেট তরবারি ছুঁড়ে দিয়ে ঘৃণার থুতু ছিটিয়ে বলল, "ছোঃ কাপুরুষ।

ফিরে যাও তোমার ব্যারাকে—যাও !”

একদিকে কার্মেনের আকর্ষণ অন্যদিকে কর্তব্যের ডাক—দুই টানে অস্থির জোসে যত অনুনয় করে, কার্মেন ততই রাগে ছটফট করে। তার আকর্ষণের চেয়ে বড় আকর্ষণ সম্ভব, কার্মেন কল্পনাও করতে পারে না। জোসে বুক থেকে কার্মেনের ফুল বের করে বলে, “কারাগারে অন্ধ প্রহরে একমাত্র সান্ত্বনা ছিল এই ফুল। তিক্ত মনে তোমাকে ঘৃণা করেছি, কিন্তু বৃথা প্রতিরোধ—নিয়তি অনিবার্য।”

অমোঘ স্বরে কার্মেন ডাক দেয়, “তাহলে আমাকে অনুসরণ করে চলে এসো পর্বতে। সেখানে মুক্ত আমরা। উপরে আকাশ, নীচে পৃথিবী। পৃথিবী আমার দেশ। আমাদের বাসনাই আমাদের বিধান। সেখানে আছে মুক্তি—মুক্তিই জিপসির প্রাণ।”

সৈন্যদলে জোসে-র ফিরে যাবার সমস্ত সম্ভাবনা দূর হয়ে গেল যখন জুনিগো তাকে ধরে নিয়ে যেতে এলো, আর স্মাগলারদের হস্তক্ষেপে তাতে অপারগ হয়ে সক্রোধে শাসিয়ে চলে গেল।

এরপর জোসে-কে দেখা গেল খাঁটি জিপসি উচ্ছলতার মধ্যে। জিপসি-দের বন্য খেলার মাতন, কণ্ঠে দুঃসাহসের সুর, তার ভিতরে সর্বনাশের সঙ্কেত—সাবধান! সাবধান! বিপদের পাক কঠিন হয়ে আসছে গলা জড়াতে। সাবধান! সাবধান!

এমন উদ্দাম পরিবেশেও জোসে বিষণ্ণ।

কার্মেন : ‘কি হল, এত বিমর্ষ কেন?’

জোসে : ‘আমি কেবল ভাবছি এক সাহসী মহীয়সী নারীর কথা, যিনি আমাকে সৎ মানুষ মনে করেন।’

কার্মেন, ঘৃণার সঙ্গে : ‘কে তিনি?’

জোসে : ‘আমার মা!’

কার্মেন, বন্য ক্রোধেঃ 'মা—মা—মা—। তুমি না পুরুষ? ছিলে সৈনিক, হয়েছ স্মাগলার—এখনো মা? না, এখানে তোমার পোষাবে না। চলে যাও দল ছেড়ে—আমাকে ছেড়ে—'

পাক খাওয়া জ্বালা হিস্ করে ওঠে জোসে-র কণ্ঠেঃ 'তো-মা-কে ছেড়ে—'

বিচিত্র হাসিতে ভরে যায় কার্মেনের মুখ। নিয়তিঘন স্বরে বলেঃ 'ওকথা বললে আমাকে খুন করে ফেলবে—এ-ই তো? তাকাও আমার দিকে, উত্তর দাও। কী, কথা বলছ না কেন? বলবে না? বলো, খুলে বলো, কিছু এসে যায় না। আমার একমাত্র প্রভু কে জানো?—কালনিয়তি।'

জিপসি মেয়েরা ভাগ্যগণনা করছে তাস নিয়ে। কার্মেন তাস হাতে নিল। প্রথম তাস রুহিতন, তারপর ইস্কাবন। তার মনে, প্রথমে তার মৃত্যু, পরে জোসে-র। নিজের মনে সে বলতে থাকে, 'তাসের ভাষা মিথ্যা হয় না। একবার যদি মৃত্যুদান ওঠে, বিশবার ফেললেও তাই উঠবে।'

স্মাগলারদের হয়ে জোসে পাহারা দিচ্ছে—এসকামিলো এলো কার্মেনের খোঁজে। বাঁকা স্বরে সে বলল, 'কার্মেন আগে একটা সাধারণ সৈনিককে ভালোবাসত কিন্তু তার প্রেমের মেয়াদ ৬ মাসের বেশি হয় না। সেই কার্মেনের প্রেমে আমি পাগল।' তখনি জোসে-র সঙ্গে এসকামিলোর লড়াই বাধে আর কি, স্মাগলারদের বাধাদানে তা ঘটল না। যাবার আগে এসকামিলো জানিয়ে গেল, কার্মেনের জন্য লড়াইয়ে তার আপত্তি নেই। প্রতিপক্ষ চাইলেই খতম্-খেল শুরু করে দেওয়া যাবে।

এই সময়ে মিসালাকে গুপ্তচর সন্দেহে ধরে নিয়ে আসা হল। সে বিপদ মাথায় করে জানাতে এসেছে, জোসে-র মা মৃত্যুদশায়। কার্মেন

বিদ্রূপ করে বলল, 'ফিরে যাও, এ-জীবন তোমার পোষাবে না।' ঈর্ষায় জ্বলছে জোসে। উন্মাদের মতো চীৎকার করে বলল, 'আমি যাচ্ছি, কিন্তু তুমি এসকামিলোর হবে তা সহ্য করব না। কার্মেন, জেনে রেখো, তোমাকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করবে—একমাত্র মৃত্যু।'

সেভিলে বুলফাইটের রঙ্গভূমিতে বিরাট জনতা। এসকামিলো আসছে —তার সঙ্গে অপূর্ব সাজে, খুশিতে মাতোয়ারা কার্মেন—জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ল। এসকামিলো কার্মেনকে বলল, 'যদি ভালোবাসো, দেখবে, আমাকে নিয়ে গর্ব করার আছে।' কার্মেন বলল,'ভালোবাসি, তোমাকে ভালোবাসি। এর থেকে বেশি ভালোবাসার আগে যেন মরে যাই।'

কার্মেনের এক সঙ্গিনী সতর্ক করে গেল, জনতার মধ্যে জোসে-কে সে দেখেছে। কার্মেন নির্ভয়। সে জোসে-র সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে সব ইতি করে দিতে চায়।

কার্মেন ও জোসে মুখোমুখি দাঁড়াল।

হৃদয়ের গভীরে কার্মেন বুঝেছে, তার জীবনের উপরে যবনিকা নামছে। কিন্তু সাহসে ও তেজে সে দীপ্ত। সে বীরকে ভালোবাসে, কাপুরুষকে নয়। যার পিছুটান আছে, তাকে সে ঘৃণা করে।

জোসে কিন্তু শাসাতে আসে নি—এসেছে ভগ্নহৃদয়ের শেষ অনুনয় জানাতে।

জোসে: 'কার্মেন, যা ঘটে গেছে, তাকে ভুলে গিয়ে তুমি কি চলে আসতে পারো না—স্পেন থেকে অনেক দূরে—অন্য এক মুক্ত আকাশের নীচে?'

কার্মেন: 'তা হয় না। শেষ হয়ে গেছে সব কিছু। আমি মিথ্যে স্তোক দিতে পারব না।'

জোসে, ব্যাকুল স্বরে : 'এখনো সময় আছে, ভেবে ছাখো। তুমি কি তোমাকে বাঁচাতে চাও না—সেই সঙ্গে আমাকেও ?'

কার্মেন : 'আমি জানি, আমার সময় ঘনিয়েছে। আমি জানি, তুমি আমাকে মারবে। কিন্তু মরি বা বাঁচি, আমি আর কখনো হব না তোমার।'

জোসে, বুক-নিংড়ানো স্বরে : 'কার্মেন রাজি হও, বলো, হাঁ। আমি তোমার সঙ্গে দস্যু-দলে যোগ দেব। যা বলবে তাই করব। শুধু বলো, হাঁ।'

কার্মেন : আমার একটিই উত্তর :

কার্মেন আর কখনো হবে না তোমার।…
মুক্ত হয়ে সে জন্মেছে, মুক্তিতেই মরবে…
কার্মেন আর কখনো হবেনা তোমার।

ঠিক এই সময়ে রঙ্গস্থলে উঠল এসকামিলোর জয়ধ্বনি। সোল্লাসে কার্মেন ছুটে যেতে চাইল—জোসে আটকালো। বাসনার আগুনে পড়েছে ঈর্ষার আহুতি। প্রতিহত কার্মেনের কণ্ঠ তরবারির মতো ঝলসে ওঠে :

'আমি ভালোবাসি এসকামিলোকে—
তার অর্থ যদি হয় মৃত্যু—তবু ভালোবাসি।'

দর্শকের উল্লাস আছড়াচ্ছে সমুদ্রগর্জন তুলে। কার্মেন আবার ছুটে যেতে চায়—সামনে এগিয়ে আসে জোসে—একেবারে জ্ঞানহারা। পাগলের মতো চীৎকার করে বলে, 'এসকামিলোর বাহুবন্ধনে বাঁধা থেকে তুমি উপহাস করবে আমাকে—না, কদাপি হতে দেব না তা।'

ফণা ধরে তুলে ওঠে কার্মেন : 'হয় আমাকে যেতে দাও, নয় মেরে শেষ করে ফেলো।'

কাতর কণ্ঠে জোসে বলে : 'এই শেষবার বলছি, এসো আমার সঙ্গে, নচেৎ—'

কার্মেন জোসে-র দেওয়া আংটি তার মুখের উপর ছুঁড়ে দেয় চরম উত্তর-রূপে।

ওধারে আবার কল্লোলিত জনতা—এসকামিলোর কীর্তিতে।

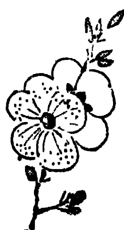
বেগে পাশ কাটিয়ে ছুটে যেতে চায় কার্মেন—লাফিয়ে সামনে দাঁড়াল জোসে—উপরে উঠল নির্মম হস্ত—নেমে এলো অন্ধ রোষে—

মরণাহত কার্মেন লুটিয়ে পড়ল।

তার পাশে নতজানু জোসে মর্মান্তিক যাতনায়।

ধেয়ে এসেছে জনতা—ঘিরে ফেলেছে তাদের। তার মধ্য থেকে থরথরিয়ে কেঁপে শিউরে-শিউরে উঠতে লাগল ভালোবাসার রক্তাক্ত কান্না—

> 'হনন করেছি ওকে—হাঁ—ঐ—
> ঐ আমার প্রেম—আমার প্রাণ—আঃ! কার্মেন!
> জাগবে না কোনোদিন—কার্মেন!—কার্মেন!'





প্রতিভার নমস্কার প্রতিভাকে

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম.
তুচ্ছ সূর্য তারা সোম--

কালভের সেই অবস্থা এলো। বহু তারকায় আলোকিত অপেরা-জগতে কালভে এখন চন্দ্রমা।

অপেরার স্বর্ণযুগে কালভের সঙ্গে গেয়েছেন ঃ

ভিক্তর মোরেল—বিরাট ট্রাজেডিয়ান, ফলস্টাফ ও ইয়াগোর ভূমিকায় অদ্বিতীয়, মঞ্চে অতুলনীয় মর্যাদার ভঙ্গি। জ্যঁা দ্য রেজ্‌কে—প্রেমিকার স্বপ্নের রোমিও. গীতিকৌশলে অনতিক্রান্ত। তাঁর ভাই এডুয়ার্দ দ্য রেজ্‌কে—কণ্ঠস্বরের গৌরবে ভ্রাতার পরিপূরক। মার্চেল্লা সেমব্রিচ—কোমল সুন্দর গানের অপূর্ব গায়িকা, অনবদ্য যাঁর পরিমার্জনা। মেল্‌বা—যাঁর অম্লান শুদ্ধ কণ্ঠস্বর স্কাইলার্কের মতো পাখা মেলে দেয় স্বর্গের

দিকে। লিলি লেম্যান—গানের আঙ্গিক-জ্ঞানে ও প্রয়োগে সুকুশলী। এমা এমস্—তাঁর মধুকণ্ঠের একমাত্র প্রতিযোগী তাঁর আশ্চর্য রূপ। ক্লেমঁতিন হুভ্যের—মোহন কণ্ঠস্বরের বিস্তৃতিতে অসামান্য। সালিনাক—জ্বলন্ত প্রকৃতি, অনুরূপ অগ্নিময় গান ও অভিনয়। প্লাঁসঁ—বিশুদ্ধ ফরাসি-রীতির এক শ্রেষ্ঠ রূপকার। এমন আরও কতজন।

একথা মনে করা ভুল—কার্মেন ভূমিকাই কালভের একমাত্র প্রতিভার সৃষ্টি। না—কালভে আরও অনেক ভূমিকায় যশস্বিনী। এমনকি কার্মেনকে সবচেয়ে প্রিয় ভূমিকা বলতেও তিনি অনিচ্ছুক। কার্মেনের নৈতিক চরিত্র কালভের পছন্দ নয়, যদিও তার সাহস ও সত্যবাদিতা ভালো লাগে।

কালভের প্রিয় ভূমিকাগুলির মধ্যে আরও রয়েছে—মার্গারিট, ওফে-লিয়া, জুলিয়েট, এল্‌জা, সান্টুৎসা।

কিন্তু···কার্মেনের মাদকতা অসামান্য। তা এনে দেয় বোহেমিয়ান জীবনের স্বাদ।

বোহেমিয়ান জীবনের প্রতি কালভের আসক্তি প্রথমাবধি। সে ইচ্ছা পূরণের জন্য একবার অপেরা-ট্যুরের সময়ে বিলাস-সজ্জিত ব্যক্তিগত গাড়িতে করে আমেরিকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। "সন্ধ্যার অনুষ্ঠানের পরে চাকার বাড়িতে ফেরা, যেখানে আরামদায়ক শোয়ার ঘর, রান্না-ঘর, খাওয়ার ঘর, স্নানের ঘর—তিনজন নিগ্রো ভৃত্যের সেবা পর্যন্ত। ঐ চাকার বাড়ির পিছন দিকে ফুলগাছে ভরা ব্যালকনি। যখন গাড়ি চলেছে—সারাদিন ঐ ব্যালকনিতে বসে থাকা—ছবির মতো দৃশ্যগুলো সরে যায় চোখের উপর দিয়ে। কখনো গাড়িটিকে জুড়ে দেওয়া হয় ট্রেনের সঙ্গে। ট্রেন চলে···মৃদু দোলনে চোখে ঘুম নামে···আমি চলেছি অন্ধকারে নূতন দৃশ্যের অঙ্কে···নূতন দিগন্তরে।"

এই ভ্রমণেই কানাডায় একদিন সকালে জেগে উঠে দেখেন, গাড়ি আটকে গেছে তুষারে—সারা রাত তুষারপাত হয়েছে, গাড়ি চলবে

না। ঠিক, কিন্তু কনসার্ট-হলে তো যেতেই হবে। "দৃশ্যটি মনে পড়লে হাসি পায়। দুই ষণ্ডা লোকের কাঁধে চড়েছি ; আমার লাল ভেলভেটের পোশাক, স্প্যানিশ কায়দার চুল, অপূর্ব সূর্যালোকে আমার অঙ্গের মণিমাণিক্য ঝলসাচ্ছে—দুই বাহকের স্কন্ধে উপবিষ্ট আমাকে নিশ্চয় জিপসি-রাণীর মতো দেখাচ্ছিল।"

হাঁ, খাঁটি এক কালভেকে এখানে পাচ্ছি বটে। তিনি বোহেমিয়ান হতে চান, তবে নিজের সাজানো গাড়িতে বসে! তিনি জিপসি হতে চান, যদি জিপসি-রাণী হতে পারেন!

কালভের কণ্ঠে যখন দৈবী সুরের লীলাভূমি রচিত হল, তখন কবি ও সুরকারেরা এগিয়ে এলেন তাঁর কাছে—নিজেদের রচনার সার্থক রূপায়ণ দেখার জন্য। খুব দুঃখের বিষয়, কার্মেনের স্রষ্টা বিজে কাল-ভেকে কার্মেনরূপে দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু অপর একজন মহান ফরাসি সুরকার কালভের কণ্ঠে বাঙ্ময় দেখেছিলেন নিজের সৃষ্টি—তিনি ফ্রেদেরিক মাস্নে (১৮৪২-১৯১২)।

মাস্নে নিজকালে ফ্রান্সের প্রধান সুরকার। ভাবোদ্বেল ইন্দ্রিয়রাগময় সুরসৃষ্টির জন্য ইনি বহুবন্দিত। উনিশ শতকের শেষের দিকে ফ্রান্সের লিরিক থিয়েটারে ইনিই প্রধান প্রভাবশালী ব্যক্তি। ব্যক্তিত্ব ছিল প্রচণ্ড, প্রতিভার ঔদ্ধত্যও। বাক্‌পটুত্বের জন্য খ্যাতি ছিল, ছুরির ফলার মতো জিভ অপরকে রক্তাক্ত করে দিত, যদি তাঁর রোষের মুখে তারা পড়ত। কালভে তাঁর অত্যন্ত প্রীতি ও স্নেহের পাত্রী, তিনিও কিন্তু ক্ষমা পাননি ত্রুটির ক্ষেত্রে। একটি ঘটনায় তা দেখা যায়।

'সাফো' মঞ্চস্থ হবার আগে সাধারণ রিহার্সালের দিন—নির্ধারিত সময়ের দশ মিনিট পরে কালভে উপস্থিত হলেন। মাস্নে উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করছিলেন। কালভে ঢোকামাত্র সকলের সামনে তীক্ষ্ণ

তিক্ত গলায় বললেন, "মাদ্‌মোয়াজেল কালভে, আপনাকে জানাতে পারি, শিল্পী নামের যোগ্য কেউ তাঁর সহশিল্পীদের বসিয়ে রাখেন না।"

কালভের মাথায় রক্ত চড়ে গেল– সকলের সামনে এত বড় অপমান! তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে এলেন। থিয়েটার-বাড়ির বাইরে পা দিয়েছেন—থমকে দাঁড়ালেন। না, চলে যাওয়া উচিত নয়। অসহ্য অপমান—তবু—।

কালভে ফিরে এসে বললেন, "বন্ধুগণ! আচার্য ঠিকই বলেছেন। দোষ আমারই। আমাকে ক্ষমা করুন। যদি আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়, আমি রিহার্সালে অংশ নিতে পারি।"

তখনি আনন্দের ঝঙ্কারে বেজে উঠল অর্কেস্ট্রা, উৎসারিত হল সমবেত কণ্ঠ, আর মাস্‌নে এগিয়ে এসে কালভেকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন।

ফ্রেদেরিক মাস্‌নে কালভের কথা মনে রেখে দুটি বিশেষ অপেরা রচনা করেন। তার প্রথমটি 'লা নাভারাইজ'—এক অঙ্কের তীব্র ভাবময় ড্রামাটিক ট্রাজেডি—কালভের প্রতিভার উপযোগী। ১৮৯৭ সালে লণ্ডনে কোভেণ্ট গার্ডেনে এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

দ্বিতীয়টি 'সাফো'—আলফঁস্‌ দোদের বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে রচিত। কালভের আশ্চর্য চতুর্থ স্বরের দিকে দৃষ্টি রেখে মাস্‌নে এই অপেরাটি প্রস্তুত করেন।

সাফো-র উৎসর্গপত্রে মাস্‌নে লেখেন ঃ

"এর পৃষ্ঠাগুলি লেখার সময়ে তুমিই ছিলে সর্বক্ষণ আমার মনের সামনে। আর তোমার মধ্য দিয়েই এ সৃষ্টি বাঁচবে। তাই দ্বিগুণিত আকারে সাফো তোমারই। অনন্ত কৃতজ্ঞতায় একে আমি উৎসর্গ করছি তোমাকেই।"

প্রখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক আলফঁস্‌ দোদেও ছিলেন কালভের গুণ-

মুগ্ধ। দোদে ফরাসি ন্যাচরালিস্টিক স্কুলের এক শ্রেষ্ঠ লেখক, তা হলেও অতিবাস্তবতায় নীরস হয় নি তাঁর রচনা, হতে পারে না, কারণ দক্ষিণ ফ্রান্সের রৌদ্রমণ্ডে তিনি সঞ্জীবিত, তাই মানবিক বাস্তবতার মধ্যে ডুব দিয়েও কল্পনার পাখায় উড়তে পারতেন। ব্যক্তিজীবনের রহস্য সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা, হিউমারবোধ, মানবিক স্খলন-পতন সম্বন্ধে সহানুভূতি, তাঁর সাহিত্যকে বরণীয় করেছে। তিনি দেখেছেন—যন্ত্রণাবিদ্ধ রচনায় তা দেখিয়েছেনও—হায়, বাসনাই মানুষের কালনিয়তি।

সাফো-র মধ্যে তাই আছে—আছে দোদের ব্যক্তিজীবনের ছায়া। প্যারিসের লোকপ্রেয়সী সাফো—হাস্যে-লাস্যে জয় করেছে কতজনকে, এবং তাদের কাছ থেকে লুণ্ঠন করেছে কত কি!—কবির কাছে সে শিখেছে সুচারু বাক্য, ভাস্করের কাছে দেহচ্ছন্দ, ইঞ্জিনীয়ারের কাছ থেকে পেয়েছে অর্থ, তার বিলাসের উপকরণ জোগাতে ক্যাশ ভেঙে জেলে গেছে কেরানী—সে ভালোবেসেছিল তার থেকে বয়সে অনেক ছোট এক তরুণ ছাত্রকে। সে ভালোবাসায় জ্বালা আছে, শান্তি নেই। সেই গরলামৃতের কাহিনী দোদে লিখেছিলেন— যিনি তরুণ যৌবনে বোহে-মিয়ান হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন সাহিত্যিক মহলে ও অন্যত্র, রূপ ও প্রতি-ভায় অলঙ্কৃত তাঁর জীবন জড়িয়ে গিয়েছিল প্যারিসের এক সুন্দরী মডেলের সঙ্গে, সে সম্পর্ক দীর্ঘ ও ক্লিষ্ট, উচ্ছৃঙ্খলতার অভিজ্ঞতা ও অভিশাপ দেহে-মনে পাক দিয়েছিল—যদিও শেষপর্যন্ত জীবনের প্রান্ত-ভাগে গার্হস্থ্য সুখ ও শান্তি কিছুটা পেয়েছিলেন।

দোদের জীবনের এই শেষ পর্বে তাঁর বাড়িতে প্রায়ই যেতেন কালভে। পড়ার ঘরে দোদেকে কালভে পেতেন, দেখতেন বহু যন্ত্রণা সত্ত্বেও তাঁর সংবেদনশীল সুন্দর মুখ প্রশান্ত। একদিন সাফো-র কথা উঠল—কিভাবে মঞ্চে সাফোকে উপস্থিত করা উচিত সেই প্রসঙ্গ।

দোদে বললেন: "বদ্‌লেয়ারের এই কথা মনে রেখো: এমন কোনো গতি আনা উচিত নয়, যা রেখার ছন্দকে ভেঙে দিতে পারে। কালভে,

তোমাকে অনুরোধ করি—সাফো অভিনয়ের সময়ে বেশি ভঙ্গি করো না, ক্লাসিক সংযম চাই। নাটকে ওকে সাফো বলা হয়েছে, কারণ সে গ্রীক নারী-কবি সাফোর মূর্তির মডেল হয়েছিল।"

১৮৬০ সালে দোদের সঙ্গে মিস্ত্রালের সাক্ষাৎ হয়। মিস্ত্রাল দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রাণোত্তপ্ত জীবন সম্বন্ধে দোদের মনে ভালোবাসা জাগিয়ে তোলেন।

কালভে একদিন খোলা গলায় দক্ষিণ ফ্রান্সের পার্বত্য রাখালিয়া গান দোদেকে শোনান। দোদে বলেন:

"তোমার গানে তুমি জাগিয়ে তোলো তোমার সমগ্র জাতিকে। তোমার ঐ পর্বতমালা, উদার উপত্যকা, উচ্চ মালভূমি—সবাই প্রাণ ফিরে পায় তোমার কণ্ঠস্বরে—বিশুদ্ধ আলোকিত কণ্ঠ—স্বর্ণোজ্জ্বল মধুবিন্দুর মতো।"





জ্বলন্ত ঝড়ে ধাবিত তলোয়ার

আরও উজ্জ্বল, আরও উদ্দীপ্ত ভাষায় কালভেকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন তিনি—যাঁকে বলা হয় দক্ষিণ ফ্রান্সের হোমার—ফ্রেদেরিক মিস্ত্রাল (১৮৩০—১৯১৪)।

বিশ্বের চিরায়ত সাহিত্যে মিস্ত্রালের কাব্যের স্থান আছে। ১৯০৫ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান—সেটা তাঁর সম্বন্ধে বিরাট কোনো সংবাদ নয়—তিনি আরও বৃহৎ পুরুষ। বহুসংখ্যক মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ তিনি—তাদের আত্মার সংগ্রামের সেনাপতি।

স্বচ্ছল অবস্থার মানুষ বলে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কাজকর্ম করার দরকার ছিল না মিস্ত্রালের—তিনি স্থির করেছিলেন, প্রভসাঁল-এর ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনরীতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন গৌরবের আসনে।

উত্তর ফ্রান্সের সংস্কৃতি-অভিমানীদের কাছে দক্ষিণের ভাষা ঘৃণার বস্তু। মিস্ত্রাল দক্ষিণের পক্ষে মর্যাদার লড়াই শুরু করেন। ১৮৫৪ সালে স্থাপন করেন ফেলিব্রিজ নামক প্রতিষ্ঠান, যার ছত্রতলে দক্ষিণ ফ্রান্সের বহু কবি, শিল্পী ও সংস্কৃতিপ্রেমিক মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। এর পক্ষ থেকে স্থানীয় ভাষায় কবিতা লেখা, পত্রিকা ও পঞ্জিকা প্রকাশ করা, স্থানীয় পোশাকের ব্যবহার এবং স্থানীয় রীতি উৎসবাদি করা ইত্যাদিতে উৎসাহ দেওয়া হত। উত্তর ফ্রান্সের রুক্ষতর ভাষা ও সংস্কৃতির আগ্রাসী দাপট থেকে দক্ষিণ ফ্রান্সের সংস্কৃতিকে রক্ষা করাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

আন্দোলনের মুখ্য নেতা মিস্ত্রাল, বলা যায় মুকুটহীন রাজা। তাঁর মনীষা, চরিত্রমাধুর্য, উপস্থিতির মহিমা, সকলকে নতশির করে রাখত।

দক্ষিণ ফ্রান্সের 'খাঁটি মেয়ে' কালভের কাছে মিস্ত্রাল নেতা গুরু আদর্শ পুরুষ। মিস্ত্রালই তাঁকে সেই ধ্রুববাক্যটি দেন, যাকে কালভে গায়িকা-জীবনে গায়ত্রীমন্ত্র করেছিলেন। মিস্ত্রাল বলেছিলেন:

"কালভে, অতীতের চারণকবিদের এই প্রাণবাণী তোমার উপযোগী: 'গায়ক গানের সুরে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে বেদনাকেও'।"

মিস্ত্রালের অসাধারণ এপিক কাব্য মিরেইল। তার মধ্যে প্রভসাঁলের উদ্দীপ্ত রোমান্টিক আত্মা উন্মোচিত। গুনো একে সঙ্গীতে রূপান্তরিত করেন ও অপেরা-রূপে তা গীত হয়। এতে আছে, খোলা আকাশের প্রেমগীতি 'ও! মাগালি!' কালভে সারা পৃথিবীতে গানটি গেয়ে বেড়িয়েছেন। অসীম জনপ্রিয়তা গানটির। দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রতিটি রাখাল সে গান জানে। এই গানের সূত্রেই কালভে মিস্ত্রালের এই উৎসর্গবাক্য লাভ করেন:

"মিরেইলের সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ গায়িকার উদ্দেশে।"

মিস্ত্রালের কথা মনে হলেই কালভের সামনে একটি ছবি ফুটে ওঠে। মিস্ত্রালের প্রতিষ্ঠিত ফেলিব্রিজের বাৎসরিক উৎসব হয় আর্ল-এ—সভা-

পতিরূপে তিনিই উপস্থিত থাকেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের মহাকায় রূপ—অবিস্মরণীয়। তাঁর চারিদিকে কবিরা সমবেত, কৃষকেরা ঘিরে-ঘিরে নাচছে, গান হচ্ছে সেই সঙ্গে, মনে হয় যেন গ্রীক-যুগের উৎসবস্থলী. কাললঙ্ঘন করে ফিরে এসেছে।

মহানায়ক মিস্ত্রালের মূর্তি স্থাপিত হবে তাঁর জীবন কালেই---আর্ল-এর বিরাট পার্কে। সুবৃদ্ধ মহাকবিকে সম্মানিত করার এই আয়োজনে নানা দেশ থেকে অভিনন্দন ও উপহার এসেছে। প্রত্যেক দেশ প্রতিনিধি পাঠিয়েছে, দূত পাঠিয়েছেন মহারাজা ও মহারাণীরা—ফ্রান্সের আত্মাকে নমস্কার জানাতে।

কিন্তু উত্তর ফ্রান্সবাসী ফরাসী সরকার কোনো প্রতিনিধি পাঠায়নি।

আর, দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রধানা গায়িকা নিমন্ত্রিত হয়েওউপস্থিতথাকতে পারবেন না।

কারণ ·মাদাম কালভে ভয়ানক ক্লান্ত। সদ্য আমেরিকাথেকে ফিরেছেন দীর্ঘ কষ্টকর সফরের পর। তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

সেই রাত্রে কালভে স্বপ্ন দেখলেন। তাঁর পিতা এসে দাঁড়িয়েছেন। পিতা, যিনি একদিন সুগভীর বাক্যে বন্দনা করেছিলেন পুত্রীর প্রতিভাকে: "তোমার গান তোমার পূর্বপুরুষদেরনীরবতার সৃষ্টি।" পিতার গর্ব—দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রাণচেতনা অবারিত হয়েছে কন্যার কণ্ঠে। সেই পিতার চোখে এখন তিরস্কার। বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বলছেন, "আমাদের বাণীর ঈশ্বর, আমাদের মহাকবির, সম্মান-উৎসবে তুমি গেলে না?"

কালভে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলেন। ঘড়িতে দেখেন, ভোর চারটে। লাফিয়ে বিছানা থেকে নামলেন। গায়ে চড়িয়ে নিলেন গ্রামীণ পোশাক। দুজন আমেরিকান মহিলা তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। তাঁদের টেনে তুলে গায়ে চাপিয়ে দিলেন প্রভসাঁল-এর গ্রাম্য নারীর পরিচ্ছদ। পুরো ফরাসি কৃষক-রমণী তাঁরা হলেন না। না হোন। তাঁদের নিয়ে চড়ে বসলেন গাড়িতে।

কালভের উৎকণ্ঠা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রচণ্ড এক শক্তি যেন তাঁকে টান দিচ্ছে, অথচ মধ্যে রয়েছে অনেকখানি ভূখণ্ড, গাড়ি যথেষ্ট জোরে যেন যাচ্ছে না, অস্থিরতার সীমা নেই। কালভে এখন একক নন, বিরাট জনমণ্ডলীর অংশ—তাঁর পূর্বপুরুষের, তাঁর জাতির, রক্তের দোলা তাঁর মধ্যে—অগণিতের হৃৎস্পন্দন বাজছে তাঁর বুকে—মোটর-গাড়ির পাখা নেই কেন—কখন পৌঁছবেন তিনি ?

আর্ল-এর যখন পৌঁছলেন তখন দিবা দ্বিপ্রহর। সভা শেষ। বিশিষ্ট অতিথিরা উঠে পড়েছেন, চলে যাবেন। স্কোয়ার কানায়-কানায় ভর্তি, সূচীভেদ্য ভিড়, কেউ এক ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে দেবে না।

তখন কালভে, সেই বিশাল জনসমুদ্রের তটে দাঁড়িয়ে গান ধরলেন—'ও! মাগালি!'—আর মুহূর্তে ম্যাজিকের মতো কাণ্ড ঘটল, জনতা দুভাগ হয়ে গেল, দেখা গেল মঞ্চ পর্যন্ত প্রসারিত পথ—সেই পথ ধরে বিজয়গৌরবে গান গেয়ে এগিয়ে গেলেন কালভে। মঞ্চে উঠে, পরম-প্রিয় মহাকবির পাশে দাঁড়িয়ে, নিম্নের ঊর্ধ্বমুখ নরসমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে, বর্ষার বৃষ্টির মতো অবিরাম ঝরে পড়লেন সঙ্গীত-ধারায়। আনন্দ! আনন্দ! যত আনন্দের গান কালভে জানেন, সব বর্ষণ করে চললেন, আর সেই বারিতে সিক্ত জনমণ্ডলী মাতোয়ারা তরঙ্গ তুলে-তুলে অভিনন্দন জানালো। কালভে যেন চাইলেন, সমস্ত পৃথিবীকে ভরিয়ে দেবেন গানে—গানে।

গান শেষ। মিস্ত্রাল উঠে দাঁড়ালেন। আশীর্বাদের হাত তুললেন। বর-দানের সুরে কণ্ঠ বাজল :

"পর্বত থেকে পাগল নদীর মতো তুমি নেমে এসেছ—তোমার জাতি-রক্তের প্রচণ্ড শক্তিকে বহন করে। তোমার জনগণের তেজ ও আনন্দের উন্মোচক আজ তুমি। জনতা তোমাকে পথ করে দিয়েছে—যখন তুমি আগুনের মতো ধেয়ে এসেছিলে। তোমার কণ্ঠস্বর লক্লকে অগ্নিশিখা, জ্বলন্ত তলোয়ার।"



পুনশ্চ একটি নাটক

'এ জীবন নাট্যশালা।'

কী অসহ্য পুরাতন কথাটা অথচ কী নিষ্ঠুর চিরন্তন।

আমরা সবাই নিজের-নিজের ভূমিকায় অংশ নিয়ে যাচ্ছি জীবনমঞ্চে, কিন্তু সে অভিনয় ধরা পড়ছে না নিজের কাছে, কারণ আমাদের চোখ তৈরি নয়। শিল্পীর প্রস্তুত চোখ। সাধারণ মানুষের তুলনায় তাঁরা জীবননাট্যের রসরহস্য বেশি উপভোগ করেন। তাঁরা দেখতে পান—দেখানও।

কালভের চোখে এমন কত নাটকীয় ছবি আঁকা ছিল। তাদের দু'-একটিকে উদ্ধার করে আনছি।

বেদনারসরক্ত এই একটি ছবি :

লণ্ডন সিজন। বর্ণে-বৈভবে, হাস্যে-লাস্যে, বাক্যে-সঙ্গীতে আলোর দেওয়ালি। লেডি ডি গ্রে-র বাড়িতে সান্ধ্য-সম্মিলনী। কালভে গিয়েছেন। সুসজ্জিত অভিজাত নারী-পুরুষ একে-একে আসছেন, দ্বারে দাঁড়িয়ে গৃহকর্ত্রী তাঁদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। অস্কার ওয়াইল্ড এসে গেলেন—আর ঝলমল করে উঠল সমাবেশ। ইংলণ্ডের অভিজাত-সমাজের নয়নমোহন তিনি, বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে অদ্বিতীয় (যুগের সবচেয়ে বাক্‌পটু বলে কথিত), গর্ব করে বলেন, "আমি আমার জীবনে ঢেলেছি 'প্রতিভা' আর সাহিত্যে দিয়েছি 'নৈপুণ্য'—তিনি আসামাত্র সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিলেন। স্যার উইলিয়ম ওয়াইল্ডের এই কনিষ্ঠ পুত্র জন্মে আইরিশ, কিন্তু লুণ্ঠন করেছেন ইংলণ্ডকে, রাসকিন ও পেটারের শিল্পতত্ত্বের ভক্তরূপে সাহিত্যে দায়িত্বহীন সৌন্দর্যচর্চায় বিশ্বাসী, জীবনযাত্রাতেও সযত্নে উদ্ভট, লম্বা চুল, বিচিত্র এলোমেলো পোশাক, মস্ত-মস্ত ফুল হাতে নিয়ে ঘোরেন, শেরিডনের পরে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কমেডি-রচয়িতা—।

অস্কার ওয়াইল্ড লেডি ডি গ্রে-কে একান্তে একটি বিশেষ অনুরোধ জানালেন। তাঁর এক বন্ধুকে এনেছেন নিমন্ত্রণ ছাড়াই। তাঁকে যদি পার্টিতে আসার অনুমতি দেওয়া হয় তিনি বাধিত হবেন। বন্ধুটি দরিদ্র কিন্তু প্রতিভাবান, ফরাসি, এখন বড় দুঃখী।

গৃহকর্ত্রী সহৃদয়া, রাজি হলেন।

অস্কার ওয়াইল্ড নিয়ে এলেন—পল ভার্ল্যানকে!

ওয়াইল্ডের পাশে ভার্ল্যান। গৌরবের শিখরাসীন ওয়াইল্ড, প্রদীপ্ত চমকপ্রদ, মণি-অলঙ্কারে ঝলসিত, বিচিত্র সজ্জিত, দীর্ঘাকার, উৎফুল্ল—ঢেকে দাঁড়িয়ে আছেন একটি সামান্য পোশাকের ন্যুব্জ মানুষকে।

অথচ পল ভার্ল্যান সাহিত্যজগতের কী নন! ফরাসি সাহিত্যের শীর্ষ-স্থানীয় বিশুদ্ধ গীতিকবিদের একজন, রোমান্টিকতার সঙ্গে সাঙ্কেতিকতার সেতুবন্ধনে কবি-স্থপতি, অনুভূতি ও ভিশনের সূক্ষ্ম আলোছায়া-

ময় পথে সঞ্চরমান, 'ফরাসি ভাষার অন্তর্নিহিত সঙ্গীতের প্রধান আবিষ্কারক', সিম্বলিস্টদের গুরুস্থানীয়।

পল ভার্ল্যান প্রথম জীবনে উদ্বুদ্ধ উড়নচণ্ডী, সাহিত্যের কাফে, আড্ডায় কিংবা সজ্জিত ড্রইংরুমে ঘুরেছেন, ঘনিষ্ঠ মিশেছেন শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে—তাঁর জীবনের শনি হয়ে এলো সাহিত্যের আর এক প্রতিভা—আরও বৈপ্লবিক প্রতিভা—আর্থার র‍্যাঁবো। উভয়ের সম্পর্ক বিকারের পর্যায়ে পৌঁছল। সেজন্য ভার্ল্যানের বিবাহিত জীবনে অশান্তি ঘটল, পত্নী ও শিশুপুত্রকে ছেড়ে র‍্যাঁবোর সঙ্গে ঘুরে বেড়ালেন উত্তর ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের নানা জায়গায়, দু'জনের মধ্যে ভালোবাসার মতো কলহও অবিরাম, ব্রাসেল্‌সে রোষান্ধ ভার্ল্যান র‍্যাঁবোকে গুলি করলেন, র‍্যাঁবোর হাতে লাগল, দু'বছরের জন্য জেলে যেতে হল ভার্ল্যানকে।

ভার্ল্যান জেল থেকে মুক্তি পাবার পরে, সমাজজীবনে তাঁর পুনর্বাসনের জন্য অস্কার ওয়াইল্ড সচেষ্ট। তাই তাঁকে এনেছেন এই মজলিশে।

কালভে ভার্ল্যানকে দেখলেন :

"সে রাত্রে হতভাগ্য কবির চোখ দুটিকে যেমন দেখেছিলাম, কোনোদিন ভুলব না। আতঙ্কিত দিশাহারা সব-হারানো এক শিশুর চোখ—সরল বিহ্বল আর কী করুণ! তারা এখনো আমাকে অনুসরণ করে যেন!...

"ওয়াইল্ডের বিশেষ অনুরোধে ভার্ল্যান অনিচ্ছা সত্ত্বেও জেলে লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন—দ্য আঁ প্রিসঁ। বুকভরা ছত্রগুলি যখন তিনি উচ্চারণ করছিলেন তখন তাঁর স্বর এমনই মর্মান্তিক ট্রাজিক যে, উপস্থিত সকলেরই চোখে অশ্রু ঝরল।"

বেশ কিছু পরের ঘটনা।

কালভে গেছেন প্যারিসের এক থিয়েটারে। নিজ আসনের কিছু দূরে তিনি একজনকে দেখলেন—যেন চেনা-চেনা। যাচ্ছেতাই পোশাক, নুয়ে পড়েছে শরীর, একেবারে বিধ্বস্ত।

লোকটি মাথা ফেরালে তবে কালভে চিনতে পারলেন—অ-স্কা-র ও-যা-ই-ল্ড। বন্ধু ভার্ল্যানের মতোই নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত। তাঁর মতোই সদ্য জেল থেকে বেরিয়েছেন, পুরাতন গৌরবের চিহ্নমাত্র নেই, অপ-মানে লজ্জায় আত্মগোপন করতে চাইছেন অপরিচিত নিরুৎসুক ফরাসি জনমণ্ডলীর মধ্যে।

লর্ড অ্যালফ্রেড ডগলাস নামক একটি কুঁহুলে, আত্মম্ভরী, নীচ ছোকরার সঙ্গে অসামাজিক সম্পর্কের অভিযোগে অস্কার ওয়াইল্ডের দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল—যখন তিনি গৌরবশীর্ষে।

কালভে দু হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন অস্কার ওয়াইল্ডের দিকে। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে ওয়াইল্ড চমকে তাকালেন। নিদারুণ! সেই একই সকরুণ শিশু-চাহনি যা ছিল ভার্ল্যানের চোখে। কালভেকে দেখে ক্ষণেকের জন্য ওয়াইল্ড কুঁকড়ে গেলেন। অসহ্য পুরনো স্মৃতি। তারপর বুকচেরা একটা কাতরোক্তি করে কালভের হাত আঁকড়ে ধরলেন, আর ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন—"ও! কালভে! কালভে!"





নানা রসের নানা কাহিনী

এই রচনার গোড়ায় কালভের সম্বন্ধে গিল্ডারের যে কবিতাংশ উদ্ধৃত করেছি, তাতে দেখা যাবে, গভীর ট্র্যাজেডির মতোই উচ্ছল হাসির শিল্পীও কালভে। কালভের আত্মকাহিনীতেও আমরা দুই ধরনের কাহিনীই পাই।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া কালভেকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। প্রতি মরশুমে কালভে লণ্ডনে গেলেই ভিক্টোরিয়া তাঁকে ডেকে পাঠাতেন উইণ্ডসর ক্যাসলে। প্রথম সাক্ষাতের দিন—বসার ঘরে কালভে অপেক্ষা করছেন —ভিক্টোরিয়া ঢুকলেন ভারতের এক তরুণ মহারাজার কাঁধে ভর করে। তরুণ মহারাজার ছিপ্‌ছিপে খাড়া শরীর, অত্যন্ত সুদর্শন, পাগড়িতে অজস্র হীরার দ্যুতি, পোশাকেও মণিমাণিক্যের প্রদর্শনী ;

আর বৃদ্ধা বিধবা মহারাণী সাধারণ কৃষ্ণবসন পরে আছেন ; কিন্তু ভিক্টোরিয়াই সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিলেন, এমনই ব্যক্তিত্ব।

উইণ্ডসর ক্যাসলে নিয়মিত যাতায়াতের জন্য—কালভে ইউরোপের বহু রাজারাণীকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। রাজপরিবারের মানুষ হওয়ার যন্ত্রণাও দেখেছিলেন। স্পেনের এক শিশু রাজকুমারী, সে পরে রাণী হয়, কালভেকে এমনই ভালোবেসে ফেলেছিল যে, সান্টুৎসার ভূমিকায় অভিনয় করার সময়ে নায়িকা-রূপিণী কালভেকে নায়ক যখন ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, তখন শিশুটি কেঁদে উঠল উচ্চৈঃস্বরে আর তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড ধমক দিল তার গভর্নেস : "মনে রেখো, কোনো রাজ-কুমারী প্রকাশ্যে কাঁদতে পারে না। একথা কদাপি ভুলবে না, তোমার প্রজাদের দৃষ্টি আছে তোমার উপর।"

উক্ত রাজকুমারীর বয়স তখন ছয় !

এর উল্টোদিকে আছেন ভিক্টোরিয়ার এক সুরসিকা কন্যা। কোনো একটি জনপ্রিয় নাটকে এক অভিনেত্রী সোসাইটি-মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। তিনি ভাবভঙ্গির কিছু বাড়াবাড়ি করেছিলেন। রাজকুমারীকে উক্ত অভিনেত্রীর অভিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "ওঁকে বিচার করার যোগ্যই আমি নই। আমার পক্ষে উনি বড্ডই গ্রেট লেডি।"

কালভের প্রতিভার প্রতি ভিক্টোরিয়ার শ্রদ্ধা থাকায় তিনি তাঁর সম্পর্কের বোন প্রখ্যাতা ভাস্কর কাউন্টেস থিয়োডোরা গ্লেইকেনকে দিয়ে কালভের সান্টুৎসার ভূমিকার একটি মর্মর মূর্তি তৈরি করান।

মূর্তি নির্মাণকালে উক্ত কাউন্টেস কালভেকে জিজ্ঞাসা করেন."পোজ্ দেবার সময়ে তুমি এমন কী ভাবো যে, এত দীর্ঘ সময় অমন তীব্র নাটকীয় ভঙ্গি বজায় রাখতে পারো ?"

কালভে বললেন, "মানবিক ঈর্ষাকে ভঙ্গিতে ফোটাতে চেয়েছি বলে

কেবলই মনে-মনে ভেবেছি—ও আমাকে ভালোবেসেছিল একদিন···
আমি ওঁকে ভালোবাসি নিশিদিন।”

এই কথাগুলিই উৎকীর্ণ আছে মূর্তিটির তলায়।

ভিক্টোরিয়ার উদারতার মতোই রসবোধ। সস্নেহ কৌতুকে অনেক সময়ে অপরের অস্বস্তি বা লজ্জা ঢেকে দিতেন। তিনি বুঝোছলেন, নিখুঁত এটিকেট কালভের সাধ্যে নেই, কেননা সে 'প্রকৃতির দুলালী!' একবার ভিক্টোরিয়া কালভের গানের শেষে বিশেষ অভিনন্দন জানালে আহ্লাদে গদগদ কালভে বললেন—“ধন্যবাদ রাজকুমারী।”

ভিক্টোরিয়া হেসে উঠলেন: “মিষ্টি মেয়ে। তুমি আমাকে যৌবন ফিরিয়ে দিলে।”

বিদায় নেবার সময়ে কালভে রীতিমাফিক সামনে মুখ রেখে পিছু হাঁটছেন—হঠাৎ পোশাকে পা জড়িয়ে পড়ে যান বুঝি। তখন আদব-কায়দা ভুলে ভিক্টোরিয়ার দিকে পিছন ফিরে পোশাক সামলালেন। বেআদবি কাণ্ড, সবাই বিরক্ত। কী জঘন্য—মহারাণীর দিকে পিছন ফেরা!

ভিক্টোরিয়ার খুশির হাসি সব ঢেকে দিল:

“ও কিছু নয়, কিছু নয়। কালভে, তোমার পিছনটাও সুন্দর··· সামনের মতোই।”

জীবনের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন বলে কালভের মধ্যে সহানুভূতি এসেছিল। তারই একটি কাহিনী:

কাভাল্লেরিয়া রাসটিকানায় কালভে যথারীতি সানটুৎসার ভূমিকায় নামছেন। থিয়েটারে গিয়ে শুনলেন, টেনর সালিনাক অসুস্থ।—“তবে চিন্তা নেই, চমৎকার এক বদলী পাওয়া গেছে, নিউইয়র্কের নামকরা গায়ক”—কালভেকে আশ্বাস দেওয়া হল।

সময় ছিল না—কালভে মঞ্চে ঢুকে নিজের গান শুরু করে দিলেন। তারপরেই বদলী টেনর ঢুকল—তাকে দেখে কালভের পায়ের ডগা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলে গেল—এক কুব্জ বামন—এ হল নিউ-ইয়র্কের নামকরা গায়ক! এই কুঁজো-পিঠ লোকটার সঙ্গে প্রেম করতে হবে—এর জন্য হতে হবে ঈর্ষায় পাগল! উদ্ভট! বিকট! প্রচণ্ড রাগে কালভে স্টেজ ছেড়ে চললেন—কেলেঙ্কারীর কথা না ভেবেই।

হঠাৎ কালভের চোখ গিয়ে পড়ল লোকটির মুখে। হতভাগ্য! ভয়ার্ত লজ্জিত, মুহ্যমান লোকটি তাকিয়ে আছে, দুই চোখে বোবা কান্না আর প্রার্থনা। কালভের বুক দুলে উঠল। আ-হা! তাঁর আর যাওয়া হল না। ফিরে এসে সুর ধরে নিলেন। এবং সেই মুহূর্তে নতুন প্রেরণাও এসে গেল। লোকটিকে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। দাঁড়ানো অবস্থায় যাকে অতি কুশ্রী কুব্জ বামন দেখাচ্ছিল, এখন সে আর ততটা দৃষ্টিকটু রইল না। কালভে হাঁটু গেড়ে বসে দুই হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরে প্রেমের, ঈর্ষার গান গাইতে লাগলেন। ঐ অবস্থায় গাইতে কষ্ট হচ্ছিল খুবই তবু পরিস্থিতি সামলাতে হবে। কৃতজ্ঞ লোকটিও প্রাণ দিয়ে গাইল। ধন্যধ্বনি উঠল চতুর্দিকে।

প্রতিবার পর্দা যখন পড়েছে, লোকটি কালভের হাত নিজের কাঁপা হাতে মুঠো করে ধরেছে, ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরেছে কৃতজ্ঞতার অশ্রু, বারবার কেবল একটি কথাই বলেছে, বলতে পেরেছে—"ধন্যবাদ! ধন্যবাদ।"

এর উল্টোদিকে আছে দারুণ ঈর্ষা ও বিদ্বেষের ঘটনা। এ কাহিনী কালভে শোনেন মাদাম লাবর্দ-এর কাছে।

গায়িকা-উত্তমা পাত্তির মাও ভালো গায়িকা। গান গাইবার ক্ষমতার অনুরূপ তাঁর ঈর্ষা করবার ক্ষমতা। একদিন গানের সময়ে তাঁর সঙ্গী-

গায়ক অপেক্ষাকৃত বেশি হাততালি পাচ্ছিলেন, আর তা দেখে ফুঁসছিলেন ঐ মহিলা।

তখনকার রীতি অনুযায়ী গায়কটির নকল ভ্রূ। অভিনয়কালে হঠাৎ চমকে মহিলা একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকালেন।

'কী হল ?' চাপা স্বরে গায়ক শুধান।

'বিশ্রী ব্যাপার। তোমার ডানদিকের ভ্রূ খুলে গেছে।'

বেচারা গায়ক, দিশাহারা হয়ে অবস্থা সামলাবার জন্য বাঁদিকের ভ্রূ টেনে খুলে ফেললেন। তারপর সকলের আনন্দ-বিধান করে কেবল ডানদিকের ভ্রূ-সহ গেয়ে গেলেন।

কালভে নিজেও একবার এমনই হিংসার শিকার হয়েছিলেন, তবে প্রস্তুত বুদ্ধির জোরে লাঞ্ছনা এড়াতে পেরেছিলেন।

অতিথি-শিল্পী হয়ে তিনি ফ্রান্সের বাইরে গেছেন কার্মেন গাইতে।

অন্য শিল্পীরা কেউই কালভের চেনা নন। অভিনয়ের আগের দিন ড্রেসরিহার্সালে পৌঁছতে পেয়েছিলেন বলে ডন জোসে-র ভূমিকায় যে-টেনর গাইবে, তাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেবার সময় পান—কিভাবে কার্মেনের মৃত্যুদৃশ্যের সময়ে অভিনয় করতে হবে। টেনর গোটা ব্যাপারটা সানন্দে বুঝে নিল।

শেষ দৃশ্য পর্যন্ত অভিনয় এগিয়ে গেল। ডন জোসে-র অভিনয় খুবই নিষ্প্রাণ হল বলে করতালি কালভেই লুঠে নিলেন। শেষ দৃশ্য—জোসে কার্মেনের পিছনে ধাওয়া করে তাকে মারবে—কিন্তু কালভের সহ-গায়ক না নড়ে কাঠের পুতুলের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দর্শকদের দিকে পিছন করে। দাঁতে দাঁত পিষে বলল : 'এখন তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারো, আমি স্টেজে তোমার পিছনে দৌড়তে পারব না।'

কালভে স্তম্ভিত। লোকটির কথা অবশ্য দর্শকেরা শুনতে পায় নি। কিন্তু এ কি সঙ্কট! সঙ্গীতের সামান্য বাকি আছে, তার মধ্যে কার্মেনকে মরতে হবে, নচেৎ সব ভণ্ডুল। মুহূর্তে কালভে বুঝলেন, ঈর্ষার জ্বালায় লোকটি তাই ঘটাতে চাইছে। একবার ভাবলেন স্টেজ ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু তা করলেই তো লোকটির উদ্দেশ্যসিদ্ধি। সে কী বলেছে, তা অন্য কেউ শুনতে পায় নি। কালভে এখানে নবাগত। সুতরাং যত দোষ তাঁর ঘাড়েই চাপানো হবে। কালভের মাথায় চিন্তার চক্র দ্রুত ঘুরতে থাকে। একটা মতলব খেলে যায়। জোসে দাঁড়িয়ে আছে ছোরা ধরে—কার্মেন যেন আত্মরক্ষার জন্য তার চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেও না পেরে জোসে-র ছোরা বুকে লেগে লুটিয়ে পড়ল। আর ঠিক তখনি নেমে এলো পর্দা। তারপর মতলব ফেঁসে যাওয়ায় বিষাক্তমন লোকটির অনিচ্ছুক হাত টেনে নিয়ে কালভে দর্শকদের সামনে এসে বারবার মাথা ঝুঁকিয়ে অভিনন্দন কুড়োতে লাগলেন—পুতুলের মতো প্রতিবার লোকটির মাথা ওঠা-নামা করতে লাগল।

এরপর শোনা যাক মৃতকে মারার উপভোগ্য কাহিনী :

ফাউস্টের অভিনয় হচ্ছে। কালভে মার্গারিট। ভ্যালেণ্টাইনের ভূমিকায় নেমেছেন নিপুণ শিল্পী দেভয়ুদ।

মেফিস্টোফিলিসের সঙ্গে ডুয়েলে ভ্যালেণ্টাইন মারা যাবে, শোক করবে মার্গারিট।

ভ্যালেণ্টাইন-ভূমিকাভিনেতার বাস্তবতার দিকে বিশেষ ঝোঁক। কালভেকে বললেন, "আমি মারা যাবার পরে তুমি শোক করার সময়ে আমার মাথাটি তুহাতে উপরে তুলে ছেড়ে দেবে, যাতে অসাড় শরীর আছড়ে পড়ে দর্শকদের দেখিয়ে দেয়—মৃত্যুটা খাঁটি।'

কালভে তাই করলেন—শুধু তাই নয়, একটু বেশিই করলেন। হিসেবের গণ্ডগোল করে মাথাটা অনেকখানি তুলে ফেলেছিলেন। তারপর যখন হাত ছেড়ে দিলেন—তখন ঢ-কা-স্ করে মাথা মেঝেয় ঠুকে পড়ল।

মর্মান্তিক গোঙানির সঙ্গে মৃতব্যক্তি বলল: "তুমি আমাকে সত্যই মেরে ফেললে!"

হারেমে বেগম হবার সন্দেহজনক সৌভাগ্য থেকে কালভে কিভাবে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন, তার কাহিনী কম উপভোগ্য নয়।

কালভে গেছেন তুরস্কের 'লাল সুলতানের' প্রাসাদে গান গাইতে। ভয়ঙ্কর এই সুলতান, যাঁর নামে ইসলাম-দুনিয়া কম্পমান।

সুলতানের বিলাস ঐশ্বর্যবহুল প্রাসাদে কালভেকে মহা আড়ম্বরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গান আরম্ভের সময়ে সুলতান ছিলেন না, কিছু পরে আসেন। সঙ্গে-সঙ্গে আবহাওয়ায় বৈদ্যুতিক শিহরণ। "কুৎসিত, ঝুঁকে-পড়া অশুভদর্শন লোকটি, চোখে শকুনের দৃষ্টি—সমস্ত জায়গাটিকে যেন প্রভাবে ঢেকে দিলেন।" সবাই সামনে লুটিয়ে পড়ল। কালভের ভিতরটা আতঙ্কে শির্‌শির্ করতে লাগল। এর পরে কালভে যখন কার্মেন-নৃত্য আরম্ভ করলেন, তখন সুলতানের চোখে বিচিত্র বিদ্যুৎ। কালভে ভাবলেন, সর্বনাশ! ভালো লেগে গেলেই তো গেছি! সারাজীবন হারেমে বাঁদী হয়ে কাটাতে হবে নাকি?

কালভে নাচতে লাগলেন। হাতির দাঁতের পাখা হাতে নিয়ে নাচের ছন্দে দুলে-দুলে এগোতে লাগলেন সুলতানের দিকে। কালভে সবিস্ময়ে দেখেন—সুলতানের চোখে ভয়ানক আতঙ্ক। তিনি দ্রুত উঠে গেলেন।

কালভের জন্য সুলতানের মূল্যবান উপহার এলো—অপরের হাত

দিয়ে। সুলতান অসুস্থ, আসতে পারলেন না বলে দুঃখিত। তবে কালভের নাচ দেখে তিনি খুশি।

এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরে এ-বিষয়ে তুরস্কের ফরাসি দূতাবাস-সংশ্লিষ্ট কালভের এক বন্ধুর সঙ্গে কালভের কথাবার্তা হল!

কালভে, সহাস্যে: "এই প্রথম আমার কার্মেন কাউকে তাড়িয়ে দিল।"

বন্ধু: "তুমি বোধহয় সুলতানের খুব কাছে গিয়েছিলে। তাতেই তিনি ভয় পেয়ে যান। সর্বদাই তিনি সন্দেহ করেন—কে বুঝি খুন করতে আসছে।"

কালভে, সবিস্ময়ে: "হা ভাগ্য! আমার হাতপাখা থেকে ভয়!"

বন্ধু: "আ-হাঃ! কে জানে কার্মেনের পোশাকের খাঁজে ছুরি লুকানো ছিল কি-না?"

"ঈশ্বর না চাইলে মৃত্যু হয় না"—কালভে তাও দেখেছেন।

কালভে গেছেন রোমান্টিক হাভানায়। তামাক ও মসলাগন্ধে পূর্ণ বিচিত্র জগৎ। কিন্তু এই নন্দনলোকে রাত্রিবাসের উপযুক্ত হোটেল নেই। অনেক কষ্টে ওরই মধ্যে কাজচলা গোছের একটিকে আবিষ্কার করে সেখানে কয়েকদিন আরামে তিনি কাটিয়েছেন। এমন সময় নিউ-ইয়র্ক থেকে ম্যানেজারের জরুরী টেলিগ্রাম এলো—অবিলম্বে ফিরে যাবার জন্য। তাড়াহুড়ায় বাঁধাছাঁদা করার সময়ে ছোট্ট পরিচারিকাটি সাহায্য করতে লাগল।

মেয়েটি বলল: "মাদামের চলে যাওয়াই ভাল।"

বিস্মিত কালভে শুধান: "এমন বলছ কেন?"

মেয়েটি: "মাদাম যে বিছানায় শুচ্ছেন, তাতে শুয়ে সপ্তাহখানেক আগে এক বেচারা ব্যালে-নর্তকী মারা গেছে।"

"অ্যাঁ, সে কি ? কি হয়েছিল ?"

"বলেন কেন মাদাম—পীত-জ্বর। সারা শহরে ঘরে-ঘরে ঐ রোগ এখন ; আর পট্‌পট্‌ মরছে।"

কালভে প্রায় মূর্ছিত। পীত-জ্বর—তার মানে সাক্ষাৎ যম। অত্যন্ত সংক্রামক। একই বিছানায় শুয়েছেন মৃতের। আর এক্ষেত্রে যত নিষিদ্ধ কাজ, তাই করেছেন—কাঁচা ফল, কাঁচা ঝিনুক-মাংস ভক্ষণ, দুপুরে রোদে হাঁটা, মশাভর্তি খাড়িতে নৌকা চালানো···

রাগে দুঃখে কালভে চেঁচিয়ে ওঠেন : "এ কী অন্যায় করেছ তুমি ? নির্বোধ মেয়ে, এমন ভয়ানক কাণ্ড ঘটালে ? ছি ছি, একবার বললে না ?"

মেয়েটি কেঁদে ফেলল : "বলতে পারিনি মাদাম ! আপনি এত ভালো —এমন দয়ালু—আপনি চলে যান তা চাইতে পারি কখনো ?"

তারপর সে উচ্চ দার্শনিকতার সুরে বলল : "মাদাম তো এই প্রবাদটা জানেনই, ঈশ্বর না চাইলে মরণ নেই !"

ঈশ্বর ইচ্ছা করেন নি, সুতরাং কালভে মরেন নি। ঈশ্বরের ইচ্ছা, কালভে অনেকদিন বাঁচবেন (৮৩ বছর), এবং পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়ে অনেক মানুষ, অনেক দৃশ্য দেখবেন। "অসংশোধনীয় ভবঘুরে আমি"—কালভে বলেছেন। একবার দীর্ঘকাল পৃথিবী চক্কর মারলেন—অস্ট্রেলিয়া, ভারত, চীন, জাপান, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আরও কত জায়গা। পাঁচ মাস সমুদ্রপথে রইলেন। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার উপচে গেল। কিন্তু ভ্রমণশেষে চক্ষুরোগও হল। সুতরাং ডাক্তারের কাছে গেলেন। তিনি বললেন :

"চোখের রোগ হয়েছে ? অন্য কী আশা করো তুমি? চোখ ক্লান্ত হবে না ? গত কয়েক মাসে তুমি যা দেখেছ, আমি সত্তর বছরেও তা দেখে

উঠতে পারি নি।"

সেসব অভিজ্ঞতার কথা থাক। প্যারিসের কিছু মজার অভিজ্ঞতার কথা শোনানো যাক।

জিপসি-সাজ কালভের চিরদিনই ভালো লাগে। এবং বোহেমিয়ান ভঙ্গি। তাঁর বান্ধবী, প্রতিভাময়ী গায়িকা এলেনা সান্‌জ-এরও একই রুচি। দুজনে অনেক সময়ে স্প্যানিশ ডুয়েট গেয়েছেন। একদিন তাঁরা ঠিক করলেন, ব্যালে-গায়িকার সাজে প্যারিসের রাস্তায় গান গেয়ে পয়সা জোগাড় করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন। সুতরাং জিপসির ঝালর-দেওয়া ঝলমলে পোশাক পরে মাথায় স্কার্ফ বেঁধে, হাতে গিটার নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। মনে মৃদু অভিমান, "আমাদের যৌবনকাল, দেখতেও নিন্দের নই, আর মোটামুটি গাই।"

স্পেনীয়দের বসবাস আছে এমন এক অভিজাত পল্লীতে তাঁরা ঢুকে পড়লেন। বৃহৎ ভবনগুলির দ্বারে দাঁড়িয়ে যখন তাঁরা দারোয়ানদের কাছে ভিতরে গিয়ে গান শোনাবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তখন খ্যাদড়ানি ছাড়া আর কিছু পেলেন না। তাড়া খেয়ে-খেয়ে যখন হতাশ. তখন এক সদয় দারোয়ানকে লাভ করলেন, যে-লোকটি বাড়ির ভিতর-চত্বরে দাঁড়িয়ে গাইবার অনুমতি দিল।

সৌভাগ্য! দুজনে প্রাণপণে গান গেয়ে সৌভাগ্যের সদ্ব্যবহার করতে ব্যস্ত রইলেন।

হঠাৎ বাড়ির নীচের তলার একটা জানলা খুলে গেল। অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকে গর্জন :

"আর কতক্ষণ এই ঘেউ-ঘেউ চলবে? ডাইনিগুলো কে? কুৎসিত গলায় ভুল সুরে গান গেয়ে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল? দারোয়ান! আভি নিকাল দেও!"

বাপ্‌রে। দৌড়ে পালিয়ে বাঁচেন তাঁরা। রাস্তায় বেরিয়ে বড় দুঃখে কালভের বান্ধবী বলেন: "আচ্ছা, আমরা কি সত্যি অত খারাপ গেয়েছি?"

কালভেঃ "কি জানি বাবা। শুনে তো আমার মনে হল, আমাদের না আছে গলা, না জানি গাইতে।"

বান্ধবী এলেনা হঠাৎ লাফিয়ে ওঠেন: "ঠিক আছে, দেখা যাক, গাইতে জানি কি-না? স্প্যানিশ এমব্যাসিতে নেমন্তন্ন করেছিল, যাবো না বলেছিলাম—না, যাবো, একেবারে সেরা পোশাকে, দেখব পছন্দ করে কি-না?"

স্প্যানিশ দূতাবাসে দুই পরমাসুন্দরী গায়িকার অপূর্ব সঙ্গীতের পরে যখন অভিনন্দনের বন্যা বইছে, তখন তাঁরা উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের পূর্বোক্ত ঘটনাটি বললেন।

"কি অদ্ভুত! আরে এই ঘটনাটিই তো মঁসিয়ে অমুক আমাদের একটু আগে শোনাচ্ছিলেন।"—এক মহিলা বললেন।

তারপর মহিলা মঁসিয়ে অমুকের দিকে ফিরে তাকালেন। তিনি পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

মহিলা: "দেখুন মশাই, কারা ঘেউ-ঘেউ করছিল?"

সবাই হেসে ফেটে পড়ে, মঁসিয়ে অমুক ছাড়া।

না, মঞ্চের বাইরে সাধারণ সাজে থেকেও নিছক গানের দ্বারা কালভে মনোহরণ ও কার্যোদ্ধার করতে পেরেছেন, এমন ঘটনাও ঘটেছে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় কালভে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। একটি ছোট শহরে গেছেন ঐ উদ্দেশ্যে। যেখানে একদিন পোস্টঅফিসে গেলেন—একটি রেজিস্টার্ড চিঠি আসার কথা ছিল, সেটি এসেছে কি-না খোঁজ নিতে।

কালভে: "মহাশয়, এমা কালভের নামে কোনো চিঠি এসেছে কি?"

কেরানী : হাঁ, ঐ নামে একটি চিঠি আছে। কিন্তু সেটি তো আমি আপনাকে দিতে পারি না, যতক্ষণ না পরিচয়জ্ঞাপক কাগজপত্র হাজির করছেন।"

ফরাসিনী কালভে যৎপরোনাস্তি ইংরেজিতে বলেন : "দোহাই! দয়া করুন! আমাকে আবার আসতে বাধ্য করবেন না। ওটা আমারই চিঠি। সত্যি বলছি, আমি কালভে।"

কেরানীর কণ্ঠে গভীর অবিশ্বাস : "হুম্, আপনি কালভে! অনেক হয়েছে। তাঁকে তিন দিন আগে আমি কার্মেন গাইতে দেখেছি। মোটেই তাঁর মতো আপনাকে দেখাচ্ছে না।"

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে কেরানী-মহাশয় চাপা স্বরে পার্শ্ববর্তী সহকর্মীকে বললেন : "আরে, দূর্! এ মেয়েটার চেয়ে কালভেকে অনেক ভালো দেখতে।"

কেরানীর চাপা স্বর কালভে শুনতে পেয়েছিলেন।

কালভে : "মহাশয়, আমি একথা জেনে আনন্দিত—আমি আসলে যা দেখতে তার থেকে আমাকে ভালো দেখায়। যাই হোক, আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আমি 'হাবান্যেরা' গাইব। ভরসা করি, আমার কণ্ঠস্বর দূর থেকে যেমন শোনায়, কাছ থেকেও তেমনি শোনাবে।"

মাথা ঝাঁকিয়ে কালভে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গানে—লামুর এতঁফা দ্যু বোহেম্—প্রেম যে বোহেমিয়ান শিশু বোহেমিয়ান।

সমস্ত পোস্টঅফিস স্তম্ভিত। কেরানী-ব্যক্তিটি হতবাক। কোনো কথা না বলে চিঠিটি এগিয়ে দিলেন।

হাঁ, এবার নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে—কালভে কালভেই।

এবং নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে—সারা বার্নহার্ড সারা বার্নহার্ডই।

সেদিন কালভে, অদম্য অনিবার্য কালভেকেও উৎপাটিত হতে হয়েছিল অতিমানবিক এক শক্তিবন্যায়। যৌবনের অগ্নিশিখা কালভে—সেদিন নিত্য যৌবনের প্রতিমার পায়ে নমস্কার করেছিলেন।

ঘটনাটি অবশ্য কালভের মধ্যজীবনে ঘটেনি, অনেক পরের ব্যাপার, যখন তিনি মঞ্চসঙ্গীত থেকে অবসর নিয়ে সঙ্গীত-শিক্ষিকার জীবন বরণ করেছেন। তিনি তখন বাস করছেন ফ্রান্সে নিজের দুর্গপ্রাসাদে—একদিন শুনলেন, নিকটেই অভিনয় করতে এসেছেন—

অন্য কেউ নন—

লা দিভিন সারা। দৈবী সারা। পৃথিবীতে এক এবং অদ্বিতীয় সারা বার্নহার্ড—যাঁর তুল্য অভিনেত্রী এ-পর্যন্ত হয়েছে কি-না সন্দেহ। রঙ্গমঞ্চে 'অমর যৌবন' কথাটি যদি কেউ কোনোদিন অনপনেয় অক্ষরে লিখে থাকেন, তবে সে তিনিই।

কালভের সঙ্গে সারা বার্নহার্ডের পূর্ব-পরিচয় ছিলই। কালভে যখন সঙ্গীতজগতের শীর্ষে, সেইকালেই, তার আগেও, অভিনয়জগতের শীর্ষে অবস্থিত সারা বার্নহার্ড। বহু সংগ্রাম করে, আশ্চর্য শক্তির পরিচয় দিয়ে, মাদাম কালভে দীর্ঘদিন শিখরে অবস্থান করেছেন। তাঁর থেকেও অধিক দিন শিখরাসীন ছিলেন অভিনয়মঞ্চে সারা বার্নহার্ড, আরও কঠিন সংগ্রামে জয়ী হয়ে।

সারা বার্নহার্ড নিতান্ত বৃদ্ধা এখন—এখনো তিনি অভিনয় করছেন—পারছেন তো? না-কি আত্মহনন করছেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে—জরার ছুরি দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করছেন অপূর্ব পূর্বপ্রতিমার অবয়বকে?

কালভে ক্ষুব্ধ হন, রুষ্ট হন, দীর্ঘশ্বাস ফেলেন মানুষের অনিঃশেষ উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা স্মরণ করে। কিংবা ঈর্ষাবোধ করেন এই ভেবে—এখনো উনি আছেন আলোকের সিংহাসনে, কিন্তু আমি কোথায়?

না না, তা নয়। কালভে চান, তাঁর ছাত্রছাত্রীরা একবার অন্তত দেখে আসুক প্রতিভার মহাদেবীকে। এ প্রতিভার হয়ত পুনর্জন্ম নেই।

আলোকোজ্জ্বল মঞ্চে সারা বার্নহার্ড এলেন। সেই মুহূর্তে দেখা গেল, আলোকের পরাভব আলোকের কাছে। মঞ্চে এখন কিছু নেই, কেউ নেই—সারা বার্নহার্ড ছাড়া। স্থানকালের বোধ মুছে দিয়ে কালভের চেতনায় দুলতে লাগল এক চিররূপা কালমোহিনী। কোনো শিল্পী একে অতিক্রম করতে পারেন নি—পারা সম্ভব নয়।

শেষের পর্দা নামল। সারা বার্নহার্ড মঞ্চ ছেড়ে চলে গেছেন। কালভের যেন উঠবার ক্ষমতা নেই। বার্নহার্ড যে-প্রচণ্ড অনুভূতির বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন, তা যেন ফিরতি-টানে দর্শকদের প্রাণরস হরণ করে প্রস্থান করেছে।

কালভের ছাত্রছাত্রীরা ধরে বসল—সারার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে হবে—তারা ওঁকে নমস্কার জানাবে—জানাবেই।

না, সম্ভব নয়—কালভে বলেন। তিনি জানেন, এতক্ষণ ধরে কী প্রচণ্ড শক্তিক্ষয় সারাকে করতে হয়েছে, যা এতগুলি দর্শককে আলোড়িত করে অবসন্ন করে দিয়েছে। এখন অসম্ভব ক্লান্ত তিনি, তাঁকে বিরক্ত করা যায় না।

ছাত্রছাত্রীরা নাছোড়। এ সুযোগ তারা হারাতে চায় না। স্বয়ং মাদাম কালভে সঙ্গে আছেন—তিনি যদি না পারেন, তাহলে ও-কাজ সম্ভব করতে পারবে কে?

নির্বন্ধে পড়ে কালভে রাজি হলেন।—"যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি। কিন্তু আমি তো জানি, ওঁর ক্লান্তির অবধি নেই।"

কালভে মঞ্চের পিছনে সাজঘরের দিকে চললেন। ওখানে প্রায় অনেকেই তাঁকে চেনে। সহর্ষে সকলে অভিবাদন করতে লাগল। ড্রেসিংরুমে বার্নহার্ড বিশ্রাম নিচ্ছেন, সেখানে কালভে উপস্থিত। আচ্ছন্নের মতো তিনি বসে আছেন। এক নজর দেখেই কালভে তাঁর অবস্থা বুঝলেন।

কালভেকে দেখে সারা খাড়া হয়ে বসেন। সাদরে বলেন—"আঃ

কালভে, তুমি ! সঙ্গীতরাণী !"

সারার হাত নিজের হাতে নিয়ে তুলে কালভে বলেন—"দৈবী সারা। আমি এসেছি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে।"

"ধন্যবাদ ! ধন্যবাদ !"—সারা বলেন।

"আর একটি অনুরোধ—"

সারা প্রশ্ন-চোখে তাকান।

"আমি এসেছি আমার তরুণ বন্ধুদের পক্ষে অনুরোধ জানাতে। তারা আজ আপনার অভিনয় দেখেছে। তারা একান্তভাবে চায়—আপনার পায়ে ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করবে। একবার যদি দেখা করবার অনুমতি পায়—না, বুঝতে পারছি, এখন তা সম্ভব নয়—"

"সত্যই তা সম্ভব নয় কালভে"—অতি ক্লিষ্ট স্বরে সারা বলেন—"আমার একবিন্দু শক্তি অবশিষ্ট নেই—"

অসীম ক্লান্তিতে তাঁর চোখ বুজে যায়—ঘাড় ঝুঁকে পড়ে—একেবারে নিঃঝুম।

কালভে ঝটিতি উঠে পড়েন।—"ওরা হয়ত নিরাশ হবে, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। ওরা নিশ্চয় চিরজীবন মনে রাখবে আজকের অপূর্ব অভিজ্ঞতার স্মৃতি ! ওদের পক্ষে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে যাচ্ছি।"

কালভে ফিরে যাচ্ছেন, দরজা পর্যন্ত পৌঁছেছেন, তখন বেজে উঠল সেই যাদুকণ্ঠ, যার সম্মোহনে পৃথিবী বশীভূত।

"ওরা আসুক, কালভে। ওদের অভ্যর্থনা জানাবো। কিন্তু এখানে নয়, হোটেলে, যেখানে উঠেছি। এখনি সেখানে যাবো আমি"—বার্নহার্ড বললেন।

কালভের কাছ থেকে শুভ সংবাদ পেয়ে অপেক্ষমাণ উৎসুক তরুণ-তরুণীরা আনন্দে কলরব করে উঠল। অবিলম্বে তারা হোটেলের উপবেশন কক্ষে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল বাঞ্ছিত আবির্ভাবের জন্য।

"দরজা খুলে গেল। অকস্মাৎ জায়গাটি পূর্ণ হয়ে গেল দারুণ প্রাণ-দ্যুতিতে। এই কি সেই ক্ষয়িতশক্তি অবসন্ন নারী, যাকে অল্পক্ষণ আগে থিয়েটারের ড্রেসিংরুমে দেখেছি? কল্পনাতীত রূপান্তর। ও কে—ঐ মোহিনী, প্রাণোচ্ছলা, জীবনময়ী—আসছে তরঙ্গ তুলে আমাদের দিকে! উপস্থিত প্রতিটি তরুণ প্রাণকে তিনি উপহার দিয়ে গেলেন—অপূর্ব হাসি, সহাস্য উক্তি, ধন্যবাদ, স্নেহ-প্রশ্রয়ের আলোকিত বাক্য। তারপর যখন চলে গেলেন তখন রেখে গেলেন এইসব তরুণ প্রাণের পটে অক্ষয় করে অনন্ত যৌবনের প্রতিচ্ছবি—এক অপরিম্লান কুহক-প্রতিমা—দৈবী সারা! দৈবী সারা!"



ঈশ্বরের সহযাত্রী তিনি

মৃত্যু!

চোখের সামনে লোকটি মরে গেল।

কালভে সেদিন দর্শক-আসনে বসে অপেরা দেখছেন। তাঁর অন্যতম সহ-গায়ক কাস্টেলমেরি, কমেডির অভিনয়ে সুখ্যাত—ফ্লুটো-র 'মার্থা' বইয়ে সার ট্রিস্তান ভূমিকায় এখন গান গাইছেন।

কাস্টেলমেরি স্টেজে আসামাত্র কালভের চোখে পড়ল তাঁর অবস্থা —অত্যন্ত ক্লান্ত আর অসুস্থ। মস্ত কোনো বোঝা বয়ে যেন ধুঁকতে-ধুঁকতে আসছেন।

দ্বিতীয় দৃশ্যে গ্রামের মেয়েরা তাঁকে ঘিরে আছে। মার্থার সন্ধানে সার ট্রিস্তান ধাবিত হলে তারা আটকাবে।

কালভে দেখলেন, কাস্টেলমেরি টলছেন। মনে হল, সব-কিছু পাক খাচ্ছে তাঁর চারদিকে। আকুলভাবে শূন্যে হাত ছুঁড়ে দিলেন।

গ্রাম্য মেয়ের ভূমিকার অভিনেত্রীরা ভাবল—এখনি অদ্ভুত বানিয়েছে তো! আমাদের কাস্টেলমেরির দারুণ উপস্থিত বুদ্ধি! তারা সহর্ষে মজায় যোগ দিল। ঘনিষ্ঠ হয়ে ঘিরে দাঁড়াল, হো-হো করে হাসল, টানাটানি করল, খোঁচাখুঁচি দিয়ে মজা করল, এমনভাবে জড়িয়ে ধরতে লাগল যে, প্রায় দম বন্ধ হবার জোগাড়।

কাস্টেলমেরি আকুল হয়ে খানিকক্ষণ তাদের হাত থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করলেন, তারপরে অন্তিম আর্তনাদ তুলে ছুম্ করে পড়ে গেলেন মাটিতে।

তখন সবাই ছুটে এলো। কিন্তু সব শেষ।

কালভে তাঁর শীতল মুখ থেকে মেক-আপ ঘষে তুলে ফেলার চেষ্টা করলেন। পারলেন না।

কমেডিয়ানের রঙ আর সাজসুদ্ধ তাঁকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল—কান্নার ঢেউ ঠেলে।

কমেডিয়ান ক্যাস্টেলমেরি সেরা ট্রাজিক অভিনেতার গৌরব কিনে নিলেন জীবন-মূল্যে।

অভিনেতার এই জীবন। তোমার অভিনয়কে কিনেছি আমরা। প্রতিভা সে পণ্য—ক্রয়যোগ্য। এই মুহূর্তে তুমি কেমন আছো, কী

ভাবছ—তার কোনো দাম নেই আমার কাছে। তুমি এখন আমাকে কী দিচ্ছ, সেইটুকুতেই আগ্রহ।

সেদিন কালভে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলেন, কার্মেন গাইতে যাবার আগে।

চিকাগোয় এসেছেন মহাগৌরবের চতুর্দোলায় চড়ে। নিউইয়র্কে কার্মেনের কল্পনাতীত সাফল্য ঘটেছে। সমাজের শিরোমণিরা তাঁকে প্রতিযোগিতা করে আপ্যায়ন করছেন। পৃথিবী পায়ের তলায়। কিন্তু সুখী হবার স্বভাব নিয়ে আসেন নি। এই প্রবল আবেগপ্রবণ,বাসনাময় নারী হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে প্রায়ই জড়িয়ে পড়েন। ঐজাতীয় ব্যাপারের মধ্যে সবচেয়ে গভীর একটির বেদনাময় সমাপ্তি ঘটেছে সম্প্রতি। নিঃসঙ্গতায় ভরে আছে মন। একমাত্র অবলম্বন কন্যাটি—সে চিকাগোয় সঙ্গে এসেছে। গানের শেষে বাসায় ফিরে তাকে নিয়েই ভুলে থাকতে চান সবকিছু।

অসুস্থ বোধ করলেও গান না গেয়ে কালভের অব্যাহতি ছিল না। পাগলের মতো ছুটে এসেছে দর্শক—আর তিনি গাইবেন না? উর্বশী নাচবে না, গাইবে না, দর্শক-দেবতার অমরাবতীতে?

কালভে কিন্তু অত্যন্ত নার্ভাস, স্টেজে ঢুকতে পারছেন না যেন। অথচ যখন গাইতে শুরু করলেন, কোন্ এক অপরিচিত মধুরতায় কণ্ঠ ভরে গেল। দর্শকের অভিনন্দন দারুণ।

প্রথম অঙ্কের বিরতির পরে কালভে এমনই ভগ্নশ্রান্ত যে, দ্বিতীয় অঙ্কে নামা অসম্ভব। তবু বিশেষ চেষ্টায় নিজেকে তৈরি করে নিলেন, আর দেখলেন ··গাইছেন অপূর্ব কণ্ঠে।

দ্বিতীয় অঙ্কের পরে ড্রেসিংরুমে ঢুকে প্রায় মূর্ছিত। ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, ঘোষণা করে দিন—আমি অসুস্থ, গাইতে পারব না।

এত বিধ্বস্ত কালভে আর কখনো নন। নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত পারছেন না। থরথর করছে সর্বাঙ্গ। কী যেন সর্বস্বহারা করে দিয়েছে তাঁকে।

কিন্তু ম্যানেজার ও অন্য সকলে তাঁকে অব্যাহতি দিলেন না। আজি রজনীতে যে-অলৌকিক নেমেছে তাঁর উপরে—তার দর্শনে বিহ্বল দর্শকদের দাবির মুখ বন্ধ করা যাবে না। কালভেকে যেতে হবেই। কালভে গেলেন। আর যখনি স্টেজে দাঁড়ালেন. পূর্ববৎ কোন্ এক তীব্র অনুভূতির শিহরণ বয়ে গেল তাঁর স্নায়ু-শিরায়—তিনি যেন অফুরন্ত সঙ্গীত-উৎসকে নিজের ভিতর থেকে উৎসারিত করে দিতে লাগলেন।

শেষ অঙ্কে কার্যত কালভেকে ধরাধরি করে স্টেজে পৌঁছে দিতে হল। আর কালভে গাইলেন জীবনের সেরা গান।

শেষ অঙ্কের যবনিকা যখন নামল—উন্মত্ত দর্শকের অভিনন্দন গ্রহণের জন্য অপেক্ষা না করে কোনো এক অজ্ঞাত কিন্তু নির্মম যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে কালভে ড্রেসিংরুমে ছুটে গেলেন। দেখলেন—

ম্যানেজার ও আর কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছেন বিষণ্ণ মুখে। কালভে বুঝলেন, কিছু একটা ঘটেছে, নিদারুণ কিছু।

কালভে শুনলেন —

তিনি যখন গাইছিলেন—তারই মধ্যে তাঁর একমাত্র কন্যা—সে ছিল তাঁর বন্ধুর বাড়িতে—পুড়ে মরেছে।

মা যখন গাইছিল, মেয়ে তখন পুড়ছিল।

দগ্ধ মেয়ের যন্ত্রণা গান হয়ে ঝরছিল মায়ের কণ্ঠে।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ত্রাণ শুধু মৃত্যুতে।

একদিন জলে ঝাঁপ দিয়ে কালভে জীবন থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছিলেন। সে যাত্রা তাঁর গান তাঁকে বাঁচিয়েছিল। এখন গানের গলা শুকিয়ে গেছে শেষ গান গেয়ে।

মৃত্যুই উপায়। জ্বলন্ত স্মৃতির চিতায় মৃত্যুই স্বর্গ।

কালভে আবার জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে গেলেন, কিন্তু কি

আশ্চর্য, পারলেন না। কিসের ঘোরে যেন ফিরে আসতে হল। এক-বার নয়, বেশ কয়েকবার সেই চেষ্টা, আর তার ব্যর্থতা। শেষকালে তাঁকে যেতে হল সেই বাড়িটির দিকে—যেখানে যাবার জন্য তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা বারবার বলেছেন।

সে বাড়িতে আছেন—স্বামী বিবেকানন্দ।

তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ কিছুদিন আগে চিকাগো ধর্মমহাসভায় ভাষণ দিয়ে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। ক্লাসিক দেবতার মতো চেহারা, ব্রোঞ্জের ঘণ্টাধ্বনির মতো কণ্ঠস্বর, সমস্ত দেহকে ঘিরে শক্তি ও পবিত্রতার দ্যুতি। বয়সে তরুণ কিন্তু চিরন্তন।

বিবেকানন্দ প্রচণ্ড শক্তিতে অনেককে টেনে তুলেছেন। তাঁর সান্নিধ্য উদ্দীপ্ত করে, আলোকিত। কালভেকে হয়ত তিনি সান্ত্বনা দিতে পার বেন। হয়ত গহ্বর থেকে বার করে আনতে পারবেন। কালভের বন্ধুরা বুঝিয়েছেন।

এই বন্ধুদের মধ্যে মিসেস মিলওয়ার্ডস অ্যাডামসও ছিলেন। মিসেস অ্যাডামস বিখ্যাত মহিলা ; নাট্যশিল্প, দর্শন, শরীরচর্চা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করে যশস্বিনী। এঁর বুদ্ধিমত্তা, ভাবব্যাপকতা, চিত্তগভীরতার জন্য ইনি কালভের শ্রদ্ধেয়া। ইনিও যখন উক্ত সন্ন্যাসীকে আচার্য বলেন, এবং বারেবারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাগিদ দেন, তখন কালভে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন নি। সন্দিগ্ধ কৌতূহলের সঙ্গে তিনি মিসেস অ্যাডামসের এই উচ্ছ্বাস শুনেছেন : 'বিবেকানন্দ', তার অর্থ বিবেকের আনন্দ, সত্যই বিবেকের আনন্দমূর্তি তিনি, ব্রহ্মবাদী পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, যীশুর মতো কখনো এখানে থাকেন কখনো ওখানে, তাঁর মতোই সঞ্চয়হীন, কেবল দান করেন জীবনের বাণী : সকলের সঙ্গেই সমভূমিতে দাঁড়িয়ে কথা বলতে সমর্থ ; বিশিষ্ট ডাক্তার, আইনজীবী, বিজ্ঞানী, ভাষাতাত্ত্বিক—সকলের বক্তব্য বোঝেন, তাদের বোঝাতেও পারেন—

কালভে বলেছেন—ঠিক আছে, সময় হলে দেখা হবে, তখন কৌতূহল মিটিয়ে নেব—

বন্ধুরা জোর করেছেন—বিবেকানন্দ এখন এখানেই আছেন, যাও তাঁর কাছে—তিনি নিশ্চয় তোমাকে শান্তি দেবেন—

আমাকে শান্তি দেবে একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী !—কালভের বাঁকা ঠোঁটে যাতনা ও ব্যঙ্গের রেখা। তারপরেই ঝলসে ওঠেন—আমার শান্তি মৃত্যুতে।

কিন্তু বেশ কয়েকবারের চেষ্টাতেও যখন আত্মহত্যা করা সম্ভব হল না, তখন তিনি 'দেখাই যাক না' ভঙ্গিতে বিবেকানন্দের বাসস্থানে হাজির হলেন। উদ্ধত ভঙ্গিতে জানালেন, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করতে চান।

—স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করবেন ? আসুন, নিয়ে যাচ্ছি। তবে একটা অনুরোধ, ওঁর কাছে গিয়ে প্রথমেই কিছু বলবেন না। উনি জিজ্ঞাসা করলেই তবে উত্তর দেবেন।

কালভের অহঙ্কারে ধাক্কা লাগল—কী—! তাঁকে গিয়ে চুপ করে অপেক্ষা করতে হবে ? উপায়ও নেই এখন। এসেছেন যখন তখন ফয়সালা করে নেওয়াই ভাল।

স্বামীজী মেঝের উপর বসে ধ্যান করছিলেন। কালভে দাঁড়িয়ে রই-লেন। দাঁড়িয়ে আছেনই—স্বামীজী ধ্যানলীন। কালভে ভিতরে-ভিতরে আগুন হয়ে উঠছেন। আচ্ছা অসভ্য লোক তো, একেবারে গাঁইয়া—আমার মতো জগদ্বিখ্যাত গায়িকাকে সম্মান না দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। না, এতটা সহ্য হয় না। চলে যাবো। কালভে পা বাড়িয়েছেন—তার আগে ভালো করে দেখে নিতে চাইলেন লোকটিকে। দেখলেন—

"তিনি মেঝের উপরে ধ্যানের সুমহান ভঙ্গিতে উপবিষ্ট, রক্তিম হলুদ রঙের পোশাক মেঝেয় লুটিয়ে, দৃষ্টি ভূমিতে নিবদ্ধ। কিছুক্ষণ পরে তিনি চোখ না তুলেই কথা বললেন—

" 'কন্যা মোর ! তোমার চতুর্দিকে কী না যন্ত্রণা ও সঙ্কটের আবর্ত ! শান্ত হও। তোমার প্রয়োজন শান্তি।'

"তারপর এই মানুষটি, যিনি আমার নাম পর্যন্ত জানেন না—শান্ত অবিচলিত স্বরে বলে গেলেন আমার গোপন সমস্যা ও উৎকণ্ঠার কথা। এমন-সব কথা বললেন, যা আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুরও জানার কথা নয়। মনে হল, অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত।

"অভিভূত আমি, অবশেষে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করতে পারলাম—এসব কথা আপনি জানলেন কি করে ? আপনাকে এসব কে বলেছে ?"

"মধুর স্মিত হাসিতে ভরে গেল তাঁর মুখ, তাকালেন, যেন আমি একেবারে শিশু, খুব একটা বোকার মতো প্রশ্ন করে ফেলেছি।

"কোমলভাবে বললেন, 'কেউই এসব কথা আমাকে বলেনি। বলার দরকার আছে কি ? আমি তো তোমার ভিতরটা বইয়ের খোলা পৃষ্ঠার মতো পড়তে পারছি।'

"অবশেষে বিদায় নেবার কাল এলো। আমি উঠছি—তিনি বললেন, 'যা ঘটে গেছে তোমাকে ভুলতে হবে। আবার উৎফুল্ল হও, সুখী হও। স্বাস্থ্য রক্ষা করো। নিজের দুঃখ নিয়ে একান্তে নাড়াচাড়া করো না। গহন বেদনাকে বাহ্য অভিব্যক্তিতে খুলে দাও। তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য তা প্রয়োজন, তোমার শিল্পের জন্যও।'

"তাঁর বাক্য ও ব্যক্তিত্বে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে আমি চলে এলাম। তিনি যেন আমার মস্তিষ্ক থেকে সকল জ্বরাতুর জটিলতাকে তুলে নিয়ে সেখানে ভরে দিয়েছেন তাঁর শুদ্ধ শান্ত ভাবনা।

"ধন্য তাঁর প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি—আমি আবার হয়ে উঠলাম প্রাণোদ্দীপ্ত, আনন্দময়। তিনি সাধারণ কোনো হিপ্‌নোটিক বা মেসমেরিক প্রভাব প্রয়োগ করেন নি। তাঁর চারিত্রশক্তি, আদর্শ ও লক্ষ্যের গভীরতা, এবং পবিত্রতাই আমার মনে বিশ্বাস জাগিয়েছিল। তাঁকে যখন আরও

ভালভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম তখন বুঝেছি, তিনি নিজ শক্তিতে অপরের বিশৃঙ্খল চিন্তার মধ্যে শান্তি ও সাম্য এনে দেন, যার ফলে তাঁর কথা পরিপূর্ণ অখণ্ড মনোযোগ লাভ করে।"

কালভে দেখলেন—বিবেকানন্দ চূর্ণ করেন, আবার পূর্ণ করেন। আমিত্বের অহঙ্কারকে দূর করে সেখানে বইয়ে দেন সত্যের আলোক। স্বামীজী একদিন বলছিলেন জন্মান্তরবাদের কথা: জন্মমৃত্যুর তরঙ্গে ধাবমান মানবজীবন। আমিত্ব-চেতনায় নিজেকে বেঁধে রাখলে মানুষ অনন্তে মিলিত হতে পারবে না। তা করলে আমি'র বর্ম পরে জন্ম-জন্মান্তরে সে প্রতিরোধ করে যাবে চিরন্তনের আহ্বানকে।

না—না—না—। স্বামীজীর কথা সত্য নয়। কালভে ছটফট করে ওঠেন। ওকথা সত্য হলে আমার সর্বনাশ, শিল্পের সর্বনাশ। আমিত্বের নাশ তো মৃত্যু। 'আমি' ছাড়া শিল্প হয় না, 'আমি' ছাড়া ব্যক্তি হয় না। যদি অনন্তের সঙ্গে, যদি ঈশ্বরের সঙ্গে, একাত্ম হয়ে যাই, আমার ব্যক্তিত্বের কী হবে ?

স্বামীজী হাসলেন। 'ব্যক্তিত্ব' কথাটা নিয়ে খেলা শুরু করলেন। "এদেশের তোমরা বড্ডই ভীত ব্য-ক্তি-ত্ব হারাতে।" তারপরেই বিদ্যুৎ ঝলসালো—"তোমাদের আবার ব্যক্তিত্ব ? তোমরা তো ব্যক্তিই হয়ে ওঠোনি। ঈশ্বরকে না জেনে, নিজের স্বরূপ না জেনে, কে কবে ব্যক্তি হয়ে উঠেছে ?"

তারপর স্নিগ্ধ সকরুণ হল তাঁর কণ্ঠস্বর।—"একদিন একবিন্দু জল বিশাল সাগরে পড়বার সময়ে কাঁদছিল, তোমার মতোই। সমুদ্র শুধাল —কাঁদছ কেন ? বারিবিন্দু বলেছিল, তোমার মতোই—কাঁদব না ? আমার সর্বনাশ হতে চলেছে—আমি যে একেবারে হারিয়ে যাবো। সমুদ্র হেসে উছলে উঠল—কী বোকা তুমি ! আমার মধ্যে আসছ, তার

মানে তুমি তোমার ভাইবোনদের মধ্যে আসছ। অগণ্য তোমাদের নিয়েই তো আমি—সমুদ্র। আমার মধ্যে এলে তুমি নিজেই তো সমুদ্র হয়ে যাবে। আর যদি আমাকে ছেড়ে যেতে চাও তাহলে সূর্যকিরণকে ধরে উঠে যাও মেঘের মধ্যে। সেখান থেকে আবার নেমে এসো তৃষিত পৃথিবীতে, প্রেম ও করুণার মতো।”

কালভে রক্ষা পেলেন বিবেকানন্দের শক্তিতে। কেন, কোন্ সৌভাগ্যে, তা আমরা জানি না। জীবনরহস্যের কতটুকুই বা আমাদের গোচর? আমাদের সামনে কেবল খোলা আছে কতকগুলি সংবাদ : কালভের মধ্যে ছিল শিল্পপ্রাণতার মতোই তীব্র ধর্মপ্রাণতা; একদিন তিনি সন্ন্যাসিনী হবেন, স্থির করেছিলেন; সন্ন্যাসিনী হননি, ত্যাগের জীবন তাঁর নয়, বাসনায় আলোড়িত সর্বদা, কিন্তু ঝড়ের মধ্যেও তিনি বুকের আড়ালে ঢেকে রেখেছেন স্থিরজ্যোতি একটি দীপকে—ধর্মের।

সে দীপ স্থির—কিন্তু যেকথা বলেছি—তা ঝড়ের। কালভের আত্মা অপেক্ষা করছিল সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষের জন্য, যিনি সমুদ্রমৌনের মতো সমুদ্রঝড়কেও জীবনসত্য বলে স্বীকার করবেন, যিনি বাসনা-ত্যাগের কথা বলেও আকাঙ্ক্ষার প্রবলতাকে প্রাণশক্তির মর্যাদা দেবেন।

বিবেকানন্দ কালভের সংগ্রামকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন :

“কালভে···মহীয়সী মহিলা। সাইক্লোনের মুখে দাঁড়িয়ে বিশাল পাইন-গাছ, লড়াই করে যাচ্ছে। মহান দৃশ্য।”

কার্মেনের ভূমিকায় যাযাবর বাসনাকে উন্মোচন করেন কালভে, সংকোচের সঙ্গে তিনি সেকথা বিবেকানন্দকে বললেন। উত্তরে শুনলেন—“কার্মেনকে খারাপ ভেবো না, সেও সত্য। সে মিথ্যা বলে না। উদ্দামতায় সে আত্মস্বরূপকেই অনাবৃত করে। যে অনন্যা নারীরা

প্রার্থনার শেষে ম্যাডোনাকে বলে—মাগো, আমাদের প্রার্থনায় কান দিও না, আমরা কামনার আগুনে মরতে চাই—তাদেরই জাত সে।”

একালের ধর্মনায়ক বিবেকানন্দের কাছ থেকে এই প্রয়োজনীয় সত্যটি আমরা লাভ করলাম—তথাকথিত সংস্কারের আনুগত্যই ধর্ম নয় ; ধর্ম মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির মধ্যে দিব্যতার সন্ধান ও স্বীকৃতি।

কালভের দ্বিতীয় জীবনকে স্বামী বিবেকানন্দ মহাসাগরের পথ-দেখিয়েছিলেন।

কালভের প্রণত কণ্ঠের এই নিবেদন :

“আমার মহাসৌভাগ্য, আমার পরম আনন্দ—আমি এমন একজন মানুষকে জেনেছিলাম যিনি সত্যই ‘ঈশ্বরের সহযাত্রী।’ তিনি মহতো মহীয়ান্। তিনি ঋষি, দার্শনিক, এবং যথার্থ বন্ধু। আমার আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁর প্রভাব সুগভীর। আমার সামনে তিনি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছিলেন।···আমার আত্মার অনন্ত কৃতজ্ঞতা তাঁর প্রতি।”

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী প্যারিসে গিয়েছিলেন ‘ধর্মেতিহাস সভা’য় যোগ দিতে। প্যারিসে সে বৎসর বিশ্বপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানে (বিবেকানন্দের ভাষায়) “নানা দিগ্‌দেশাগত সজ্জনসমাগম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা-প্রকাশে স্বদেশের মহিমা প্রকাশ করছেন।” তার মধ্যে বিশেষভাবে মিঃ লেগেটের ভবনে তখন প্রতিভার বিরাট সমাবেশ। বৈজ্ঞানিক হিরাম ম্যাক্সিম, জগদীশচন্দ্র বসু, দার্শনিক উইলিয়ম জেমস, সমাজতাত্ত্বিক প্যাট্রিক গেডেস, ভাস্কর অগস্ত রদ্যাঁ, অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড, ধর্মযাজক পিয়ের হিয়াসান্থ, সাহিত্যিক জুল বোয়া, সমাজজীবনে পরিচিত প্রিন্সেস ডেমিডফ, প্রিন্সেস ডোরিয়া, লেডি অ্যাংলেসী, মিসেস ওলি বল, ডিউক অব

নিউক্যাসল্, ডিউক অব রিশলু এবং আরও গণ্যমান্য মানুষ। "কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক, গায়ক-গায়িকা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক"···স্বামীজী সকলের মধ্যে নিজ দীপ্তিতে প্রকাশিত। কালভে সবিস্ময়ে স্বামীজীর বহুমুখী প্রতিভার বিকিরণ দেখেছিলেন।

প্রচণ্ড সামাজিক চাঞ্চল্যের কেন্দ্র স্বামীজী তখন। সারা বার্নহার্ডের সঙ্গে এই প্যারিসেই আবার স্বামীজীর দেখা হল। পূর্বের সাক্ষাৎ নিউইয়র্কে, ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে। বার্নহার্ড সে বৎসর নিউইয়র্কে গিয়েছিলেন 'ইৎশীল' ও অন্য কয়েকটি নাটক নিয়ে, আর পাগল করে দিয়েছিলেন আমেরিকাকে। সারা বার্নহার্ড—'পৃথিবীতে অনন্যা তিনি, বিশ্বের সর্বাধিক বন্দিত অভিনন্দিত কীর্তিময়ী নারী, লক্ষ-লক্ষ মানুষের দ্বারা অর্চিত মহাদেবী, ফ্রান্সের ইতিহাসের মহাগৌরব, পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য।' এই সারার 'ইৎশীল' অভিনয়ের অভিনবত্বে সকলে চমৎকৃত। তার বিষয়বস্তু ভারতীয়, সুতরাং স্বামীজীর বন্ধুরা তাঁকে অভিনয় দেখতে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্বামীজী 'ইৎশীল' দেখলেন, তারিফ করলেন, আবার হাসতেও লাগলেন।

সারার অভিনয়ক্ষমতা, সেই সঙ্গে নাটকে পরিবেশগত বাস্তবতা রক্ষার প্রয়াস দেখে স্বামীজীর ভালো লেগেছিল। "মাদাম বার্নহার্ড বর্ষীয়সী, [স্বামীজী লিখেছেন], কিন্তু সেজে মঞ্চে যখন ওঠেন, তখন যে বয়স, যে লিঙ্গ [স্ত্রী বা পুরুষ চরিত্র] অভিনয় করেন তার হুবহু নকল! বালিকা বালক, যা বলো তাই হুবহু। আর সে আশ্চর্য আওয়াজ! এরা বলে তাঁর কণ্ঠে রূপার তার বাজে।···এক বৎসর ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বিলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া করে দিয়েছিলেন—মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা—বিলকুল ভারতবর্ষ!! আমায় অভিনয়ান্তে বলেন, 'আমি মাসাবধি প্রত্যেক মিউজিয়ম বেড়িয়ে ভারতের পুরুষ, মেয়ে,

পোশাক, রাস্তা-ঘাট পরিচয় করেছি'।"

আর স্বামীজী হেসেছিলেন নাটকের বিষয়কাণ্ড দেখে। বিষয়—বুদ্ধজীবনী—কিন্তু ফরাসি ধাঁচে। বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধ আসীন—তাঁকে রাজনর্তকী প্রলুব্ধ করছে। ঝোঁকটা বুদ্ধের বৈরাগ্য দেখানো অপেক্ষা রাজনর্তকীর ছলাকলা দেখানোতেই বেশি পড়েছিল। "ফরাসি অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড এখানে 'ইৎশীল' অভিনয় করছেন [স্বামীজী লিখেছেন]।···এতে রাজনর্তকী ইৎশীল বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করতে সচেষ্ট; আর বুদ্ধ তাকে জগতের অসারতা উপদেশ দিচ্ছেন। সে কিন্তু সারাক্ষণ বুদ্ধের কোলেই বসে আছে। যা হোক, শেষ রক্ষাই রক্ষা—নর্তকী বিফল হল। মাদাম বার্নহার্ড ইৎশীলের ভূমিকায় অভিনয় করেন।"

অভিনয়কালে স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শক-আসনে দেখতে পেয়ে সারা বার্নহার্ড কৌতূহলী হয়ে সাক্ষাৎ করতে চান, এবং পরে উভয়ের আলাপ হয়। স্বয়ং সারা অপরের সঙ্গে যেচে দেখা করতে চেয়েছেন—এই সংবাদটি অনেকখানি বিস্ময়ের সঙ্গে গিলতে হয়েছে বিবেকানন্দের অনুরাগী পাশ্চাত্ত্য লেখকদের পর্যন্ত, যাঁদের মধ্যে ক্রিস্টোফার ইশারউড আছেন। কিন্তু সেই পৃথিবীতে সারা যেমন একমাত্র, বিবেকানন্দও তাই, 'কোনো দৃষ্টিই যাঁকে অগ্রাহ্য করতে সমর্থ নয়।' প্রেক্ষাগারে বিবেকানন্দের উপস্থিতির গরিমার একটা বর্ণনা এখানে উপস্থিত করা যায় কনস্টান্স টোনীর লেখা থেকে। কনস্টান্স টোনী অভিজাত পরিবারের মেয়ে। তাঁর মায়ের দেহে প্রবাহিত ছিল ফরাসি রাজরক্ত, সেকালের এক বিখ্যাত সুন্দরী তিনি, দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী হিসাবে 'কালো প্যাগান লোকটি'(অর্থাৎ স্বামীজী) সম্বন্ধে প্রারম্ভিক ঘৃণা ছিল, পরিচয়ের পরে সেটা ক্রমে কেটে যায়। এহেন জননীকে কনস্টান্স টোনী ধরে বসলেন—স্বামীজীকে নিয়ে তিনি মেট্রোপলিটান অপেরায় যাবেন। ভ্রাতা বিবেকানন্দের রূপসৌন্দর্য আর মহান ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ভগিনী

টোনীর গর্বের সীমা ছিল না। 'ক্লাসিক ভাস্কর্যের মতো রূপময় তিনি··· বৃহৎ দুই চক্ষু মধ্যরাত্রির মতো নীল··· মুখে আত্মার বিজয়ী জ্যোতি'— এঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার গৌরব ছাড়তে রাজি ছিলেন না 'চব্বিশ বছরের শুভ্র, কৃশ, দীর্ঘ, স্বর্ণকেশী, নীল ধূসর চক্ষু' কনস্টান্স টোনী। তিনি লিখেছেন :

"একবার এক সোমবার সন্ধ্যায় মেট্রোপলিটান অপেরায় ফাউস্ট-এর শ্রেষ্ঠ-তারকা-সম্মিলিত অভিনয়ে—যেখানে গোটা সোসাইটি বক্স-আসনে উপস্থিত—হীরা-জহরতে মোড়া শরীর দেখাতে, গাল-গল্প করতে, দেরীতে এসে আরও দর্শনীয় হতে—সব কিছু করতে, কেবল অপেরা দেখতে নয়। তখন মেল্‌বা-র প্রতিভার যৌবনদিন, তিনি ছিলেন, রেজ্‌কে-রা (জ্যাঁ দ্য রেজ্‌কে এবং এডুয়ার্দ দ্য রেজ্‌কে), এবং বয়্যারমেইস্টার। স্বামীজী আগে কখনো অপেরা দেখেন নি। আমাদের রিজার্ভ-করা আসন ছিল অর্কেস্ট্রা সার্কেলের মধ্যে সেরা এক-জায়গায়। আমি মাকে বললাম, 'স্বামীজীকে আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো উচিত।' মা তা শুনে স্বামীজীর দিকে ফিরে বললেন—'কিন্তু আপনি কৃষ্ণকায়। আপনাকে নিয়ে গেলে পৃথিবীর লোক বলবে কি?' স্বামীজী শুনে হেসে উঠে বললেন, 'আমি আমার বোনের পাশে বসব। সে কিছু মনে করবে না আমি জানি।'

"সেদিনের চেয়ে বেশি রূপময় কখনো তাঁকে দেখিনি। আমাদের আশেপাশে যারাই ছিল, সবাই তাঁকে নিয়ে এমনই চঞ্চল ছিল যে, আমি নির্ঘাত বলতে পারি, তারা সে-রাত্রে অপেরায় দৃষ্টি দিতে পারেনি।

"আমি ফাউস্টের গল্পটি স্বামীজীকে বোঝাতে চাইলাম। মা শুনে বললেন, 'হা ভগবান! তুমি অল্পবয়সী মেয়ে, তুমি ঐ বিকট কাহিনীটি একজন পুরুষমানুষকে শোনাচ্ছ! একাজ একেবারে ঠিক নয়।'

'ব্যাপারটা যদি ভালোই না হয়, তাহলে একে এখানে পাঠালেন

কেন'—স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন।

" 'অ্যাঁ—হ্যাঁ। অপেরায় আসতে হয়। ওটা একটা করণীয় কাজ। কিন্তু সব কাহিনীই বদ। তাই কাহিনী নিয়ে আলোচনার কোনোই প্রয়োজন নেই'।"

মায়ের নির্বুদ্ধিতায় কনস্টান্স টৌনী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হায়, এই জগৎ এবং তার আত্মপ্রবঞ্চনা!

অভিনয়ের মধ্যে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বোন, ঐ যে ভদ্রলোকটি সুন্দরী গায়িকার সঙ্গে প্রেম করছে, ওকি সত্যিই মেয়েটিকে ভালবাসে?"

"নিশ্চয় স্বামীজী"—টৌনী উত্তর দেন।

"কিন্তু লোকটি কত অন্যায় করেছে, মেয়েটিকে কত দুঃখ দিয়েছে—"

"তা ঠিক"—নম্রভাবে স্বীকার করেন টৌনী।

"হুম্, এখন আমি বুঝতে পেরেছি"—স্বামীজী বললেন—"লোকটি ঐ সুন্দরী মেয়েটির প্রেমে পড়েনি, আসলে প্রেমে পড়েছে ঐ লাল কাপড়-পরা লেজ-ওয়ালা সুন্দর লোকটির সঙ্গে—একে তোমরা কি যেন বলো—শয়তান—তাই না?"

আমেরিকার সবসেরা অপেরায়—শ্রেষ্ঠ তারকাদের সম্মিলিত অভিনয়ের সন্ধ্যায়, যদি বিবেকানন্দ প্রেক্ষাগারের সর্বাধিক দৃষ্টি-আকর্ষক ব্যাপার হন, তাহলে তাঁর উপরে মঞ্চ থেকে সারা বার্নহার্ডের দৃষ্টি পড়তেই পারে। বিশেষত—আগেই বলেছি—বিষয় ভারতীয় এবং নায়ক বুদ্ধ। বিবেকানন্দের মুখের সঙ্গে বারে-বারে বুদ্ধ-মুখের সাদৃশ্যের কথা বলা হয়েছে আমরা জানি। কেবল বহিরবয়বে তিনি বুদ্ধ নন—ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রেও নব বুদ্ধ—একথাও বলা হয়েছে। মঞ্চে অভিনয়-কালে সারা বার্নহার্ড অভিনেতা-বুদ্ধের সামনে রূপের ছলনা বিস্তার

করছিলেন, প্রত্যাখ্যাত হচ্ছিলেন এবং শুনছিলেন বৈরাগ্যের বাণী—অকস্মাৎ তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল প্রেক্ষাগারে—আশ্চর্য, ওখানে কে বসে—স্বয়ং তিনি নন কি, যাঁকে এখানে মঞ্চে মেক-আপের আবরণে উপস্থিত করেছি। সেই মুহূর্তে কোন্ বিদ্যুৎচমক সারা বার্নহার্ডের মনে খেলে গিয়েছিল বলতে পারব না—এক বিচিত্র নাটকে তিনি যেন অভিনয় করছিলেন—মঞ্চে সাজানো বুদ্ধ—প্রেক্ষাগারে আসল বুদ্ধ—আর তিনি ছলনাময়ী নর্তকী। মঞ্চের বুদ্ধ আড়ষ্ট, আরোপিত গাম্ভীর্যে অনড়, বিশুষ্ক বৈরাগ্যবাণী শোনাচ্ছেন; আর প্রেক্ষাগারের বুদ্ধ সহাস্য, উৎফুল্ল; ভাবছেন, মোহমায়ার কী অদ্ভুত লীলা! হয়ত ভাবছিলেন, সারা বার্নহার্ডের কুহকের চেয়ে কি বেশি কুহক থাকা সম্ভব ছিল বুদ্ধের কালের সেই রাজনর্তকীর? সারা বার্নহার্ডকে কি কোনো কালে কেউ অতিক্রম করতে পেরেছে? আর···কে জানে তিনি ভাবছিলেন কিনা···ঐ প্রলোভনের লীলা-ছলা এই মুহূর্তে আমাকে কিন্তু আক্রমণ করছে না ··না, এটা অভিনয় ··আমি বুদ্ধ নই, উনিশ শতকের বিবেকানন্দ· ·বসে আছি থিয়েটার হলে···অভিনয় দেখছি···

সারা বার্নহার্ডের ইচ্ছানুসারে নিউইয়র্কের 'সম্ভ্রান্ত' মিঃ করবিনের বাসভবনে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়েছিল। অন্য আরও দুজন বিখ্যাত ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন—ফরাসী ব্যারিটোন গায়ক ভিক্তর মোরেল এবং তৎকালে পৃথিবীর প্রধান বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানী, যুগের 'থর দেবতা'-রূপে কথিত নিকোলা টেসলা। আলোচনায় অনেক কিছুই ঘোরাফেরা করেছিল। সারা বার্নহার্ড নিশ্চয় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। স্বামীজী নিশ্চয় সারাকে তাঁর অভিনয়ক্ষমতা, ভারত প্রীতি ইত্যাদির জন্য প্রশংসা করেছিলেন। তারপর স্বভাবতঃই ভারতীয় ধর্মদর্শনের আলোচনা এসে পড়েছিল। "মাদাম বার্নহার্ড খুব সুশিক্ষিত মহিলা এবং দর্শনশাস্ত্র অনেকটা পড়ে শেষ করেছেন। মোরেল উৎসুক্য দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু মিঃ টেস্‌লা বৈদান্তিক প্রাণ ও

আকাশ এবং কল্পের তত্ত্ব শুনে মুগ্ধ হলেন।”

সারা বার্নহার্ড কিন্তু বেশি অগ্রসর হলেন না। বুদ্ধের মতো অবয়ব-বিশিষ্ট ভারতীয় সন্ন্যাসীকে তিনি দেখে নিয়েছেন, যাঁর দ্যুতিময় ব্যক্তিত্ব, গভীর দার্শনিক প্রতিভা, চিত্তাকর্ষক বাচনভঙ্গি ; বেশ কথা, আর একটি ইনটারেসটিং লোকের সঙ্গে পরিচয় হল ; কিন্তু ব্যাপারটার শেষ এখানেই। সারা বার্নহার্ডের জীবনে ধর্ম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়,···এবং···ঐকালে তিনি এমন কোনো গুরুতর জীবনসমস্যায় উৎপীড়িত নন যে, ধর্মের মানুষের অলৌকিক ক্ষমতার কাছে আশ্রয়-ভিখারী হতে হবে। “তাঁর জীবনীকারদের মতে, ধর্মের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটেছিল কেবল বাল্যে ও কৈশোরে, যখন তিনি ফ্রান্সে এক কনভেণ্টে কয়েক বছর ছিলেন। সেখানে এগার বছর বয়সে তিনি ব্যাপটাইজড্ হন এবং কিছু সময় একান্তভাবে ভেবেছিলেন নান্ হবেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এক বন্ধুকে বলেন, ‘‘সারাজীবন আমার পক্ষে সন্ন্যাসিনী হয়ে কাটানো সম্ভব ছিল কি-না সন্দেহ। আমি কখনই খাঁটি ধর্মীয় মানুষ নই। সন্ন্যাসিনীর চতুর্দিকে যে গরিমা, রহস্য, সর্বোপরি প্রশান্তি ঘিরে থাকে, তারই প্রতি ছিল আমার আকর্ষণ। যদি সন্ন্যাসিনী হতাম, তাহলে মাসকয়েক কাটার আগেই কনভেণ্ট ছেড়ে পলায়ন করতাম।”

“সারা বার্নহার্ড যদি কোনো জিনিসকে নিজ জীবনে প্রত্যাখ্যান করে থাকেন, তা হল প্রশান্তি,” লুই বার্ক লিখেছেন, “তিনি ভালবাসতেন উত্তেজনা, জন-সম্পর্ক, জয়বাদ্য।···শিল্প ও কর্মজীবনের সাফল্য নিয়েই তিনি পুরো ব্যাপৃত ছিলেন—ঐ দুটি জিনিসই তাঁর প্রধান ভালবাসার বস্তু।”

বিবেকানন্দের সঙ্গে যদি সারা দেখা করতে চেয়ে থাকেন, সে তাঁর বিরাট মহান বিস্ময়কর উপস্থিতি সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েই, জীবনের সংকট মোচনের জন্য নয়। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে যখন আবার

বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা হল তখনও সারার সেইএকই মনের রূপ—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সেই পুরাতন কৌতূহল, রহস্যভরা দেশটিও তার মানুষদের দেখার জন্য আগ্রহ—কিন্তু আগ্রহ অতিরিক্ত না হওয়ায় সে ইচ্ছা স্থগিত। "বার্নহার্ডের অনুরাগ—বিশেষ ভারতবর্ষের উপর। [স্বামীজী লিখেছেন—] আমায় বারংবার বলেন, তোমাদের দেশ 'ত্রেজাঁসিএন, ত্রেসিভিলিজে'—অতি প্রাচীন অতি সুসভ্য। বার্নহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল—'সে মঁ র‍্যাভ, সে মঁ র‍্যাভ'—সে আমার জীবনস্বপ্ন। আবার প্রিন্স অব ওয়েলস্ তাঁকে বাঘ, হাতী শিকার করাবেন প্রতিশ্রুত আছেন। তবে বার্নহার্ড বললেন—সে দেশে যেতে গেলে দেড় লাখ, দু'লাখ টাকা খরচ না করলে কি হয়? টাকার অভাব তাঁর নাই—লা দিভিন্ সারা!!—দৈবী সারা—তাঁর আবার টাকার অভাব কি?—যাঁর স্পেশাল ট্রেন ভিন্ন গতায়াত নেই!—সে ধূম-বিলাস, ইউরোপের অনেক রাজা-রাজড়া পারে না; যাঁর থিয়েটারে মাসাবধি আগে থেকে দুনো দামে টিকিট কিনে রাখলে তবে স্থান হয়, তাঁর টাকার বড় অভাব নেই, তবে সারা বার্নহার্ড বেজায় খরচে। তাঁর ভারতভ্রমণ কাজেই এখন রইল।"

বিবেকানন্দ ও বার্নহার্ডকে পাশাপাশি রেখে দেখার চেষ্টা করেছেন ক্রিস্টোফার ইশারউড। স্বামীজীর মন্তব্যের উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন:

"এই কয়েকটি ঈষৎ বিদ্রূপাত্মক ছদ্মগম্ভীর বাক্যের মধ্যে সহানুভূতি ও পছন্দের তাপ অনুভব করা যায়। উক্ত ক্ষুদ্রাকার সেমিটিক ফরাসি নারীর সামনে স্বামীজী বসে আছেন– ছবিটি কল্পনায় দেখে নেওয়া যেতে পারে—বৃহৎ আকারের মানুষ তিনি, উৎফুল্ল, মজা-লাগা চোখে ঐশ্বর্য আড়ম্বরভরা পরিবেশটি দেখে নিচ্ছেন—ঝলমলে মণিমাণিক্য, ঝকঝকে আয়না, রেশমী সজ্জা, অপূর্ব পোশাক, প্রসাধন দ্রব্যের সমাহার। এখানেও তিনি, যেমন সর্বত্র করেন, নারীকে নিজ কন্যা, ভগিনী,

মাতা বলে নমস্কার করেছেন। এখানেও, যেমন সর্বদা করেন, সেই নিত্য ঈশ্বরের কাছে প্রণত হয়েছেন, যিনি বিচিত্র এক ছদ্মবেশ ধরে উপস্থিত আছেন, যা আত্মোপলব্ধির পথে যাত্রাকালে আমাদের বিভ্রান্ত করে। এখানে অধিকন্তু তিনি নিশ্চয় সেই বিশেষ গুণটির অনন্যসাধারণ প্রকাশকে লক্ষ্য করেছিলেন যাকে অত্যুচ্চ সমাদর করতেন—সা-হ-স! প্রচণ্ড রকমের বিপরীত এই দুই চরিত্রের মধ্যে সাহসই বোধহয় একমাত্র সাধারণ গুণ। সাহস—যা বিবেকানন্দকে তাঁর ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন আধ্যাত্মিক জীবনঝঞ্ঝার প্রহরে রক্ষা করেছিল, রক্ষা করেছিল তাঁর আচার্যের দেহান্তের পরে; তারপরে রামকৃষ্ণ সংঘের আদিপর্বের সংঘাত ও সঙ্কটের মধ্যে; তা তাঁকে কখনো ত্যাগ করেনি—গহন অরণ্যে, পর্বতশীর্ষে কিংবা কোটিপতি আমেরিকানদের ড্রইংরুমে, যেখানেই তিনি থাকুন। সাহস—সাহসই সারা বার্নহার্ডকে শক্তি দিয়েছিল নিজ শিশুর অধিকাররক্ষার সংগ্রামের সময়ে, কিংবা প্যারিস অবরোধের কালে, বা ড্রেফ্যুস-এর পক্ষ সমর্থনের কালে কিংবা ডান পা কেটে বাদ দেবার পরেও ৭২ বছর বয়সে মঞ্চে প্রত্যাবর্তনের কালে। স্বামীজী নিশ্চয় এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন, এবং এই কারণে তাঁকে পছন্দ করেছিলেন।

"আর বার্নহার্ড স্বামীজীর বিষয়ে কী ভেবেছিলেন? হয়ত বিচিত্র শোনাবে, তবু মনে হয়—নিজের এক ধরনের সহকর্মী। বিবেকানন্দও কি তাঁরই মতো সর্বসমক্ষে জয়ধ্বনির মধ্যে আবির্ভূত হননি? অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী, জোয়ান অব আর্ক সাজে স্বয়ং সারাও, সেন্টদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, এবং পাদপ্রদীপের অপরদিকে উপবিষ্ট দর্শকদের খুশি করেছেন। স্বামীজী অপরপক্ষে তাঁর অতুলনীয় অবয়ব ও ব্যক্তিত্ব এবং গভীর নিনাদিত কণ্ঠস্বরের জন্য বিরাট অভিনেতা বলে গৃহীত হতে পারতেন।

"এই পর্বের একটি ফটোগ্রাফে আমরা দেখি, ভক্তি ও সংশয়ের মিশ্র

অগ্নিতে অসহ্য জ্বলন্ত-তরুণ সন্ন্যাসীর দুই চোখ কোমল ও গভীর রূপ নিয়েছে পরিণত একটি মানুষের মুখাকৃতিতে। বিস্তৃত ওষ্ঠে এবং স্ফীত নাসারন্ধ্র থেকে ছড়িয়ে-পড়া গভীর রেখাগুলিতে উন্মুখ হাসি—না, তাতে বিদ্রূপ, তিক্ততা কিংবা আত্মসমর্পণ নেই—আছে শুধু বিশাল স্থির শান্তি, যেন সমুদ্রের, নিশ্চয়তা ঘনিয়েছে যার উপরে, অনন্তের সূর্যোদয়ের জন্য। 'আপনি কি কখনো গম্ভীর হবেন না স্বামীজী?' কিছুটা তিরস্কারের ভাষায় একজন প্রশ্ন করেছিল। স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন, 'নিশ্চয় তা হব. যখন পেট কামড়াবে।' তাও ঠিক নয়, এই ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের হাসি কৌতুকপ্রবণ বিবেকানন্দ ইতিমধ্যেই গভীর ভাবে অসুস্থ।"

সারা বার্নহার্ডের কোনো জীবনীতে স্বামীজীর উল্লেখ নেই। সেই অনুল্লেখের গভীর অর্থ ঈশারউড উন্মোচন করেছেন :

"বার্নহার্ডের যে আধ ডজন জীবনীর পৃষ্ঠা আমি ওল্টাতে পেরেছি, তার কোনোটিতে বিবেকানন্দের নাম পর্যন্ত উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত উভয়ের সাক্ষাতের সংক্ষিপ্ত ঘটনা, যাতে রীতিমাফিক অল্প কিছু কথা-বার্তা এবং ভদ্রতা-বিনিময় হয়েছিল, সেটা গুরুতর কোনো ব্যাপার নয়। আর সেটাই ঘটনাটিকে এত চিত্তাকর্ষক ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। কবি বা রাজনীতিকেরা একত্র হলে আমরা কথার ফুলঝুরি আশা করি, কারণ কথাই তাঁদের অভিব্যক্তির মাধ্যম। কিন্তু জ্যোতির তনয়ের ক্ষেত্রে কথা মুখ্য বাহন নয়। তাঁদের প্রবেশ আরও সরাসরি এবং সূক্ষ্ম ও অন্তর্ভেদী। আমাদের প্রতিদিনের জাগ্রত মনের অগোচরে তিনি সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি প্রিন্স অব ওয়েলসের বিষয়ে কথা বলেছেন, কিংবা ঈশ্বরের বিষয়ে, কিংবা কিছু বলছেন না শুধু হাসছেন—সেই মুহূর্ত থেকে নিশ্চয় তোমার সমগ্র জীবন কোনো না কোনো-ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

"সেই কারণেই, বার্নহার্ডের জীবনীকারদের নীরবতা সত্ত্বেও, এবং

উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক আলোচনা হয়েছিল, এই সংবাদ না থাকলেও, নিঃসংশয়ে বলতে পারি না যে, স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সারার জীবনে বৃহৎ কিংবা স্থায়ী কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি। ইতিহাসের সন্ধানী আলোকরেখা মানুষের বহির্গত কর্মের ক্ষুদ্র একটি অংশকে তীব্র আলোকিত করে—তা কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করতে সমর্থ নয়। এখানে এইটুকুই আমরা বলতে পারি: জগতের সমক্ষে দুই মানব-রহস্যরূপে আবির্ভূত বার্নহার্ড ও বিবেকানন্দ—একদিন মিলিত হয়েছিলেন, উভয়ে বিনিময় করেছিলেন কিছু সংকেত, যাদের অর্থ আমরা জানি না—তারপর তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন—কেন, তাও জানি না। কেবল এইটুকু জানি, তাঁদের এই সাক্ষাৎ ব্রহ্মাণ্ডের অপর সকল ঘটনার মতোই অকারণে ঘটেনি।"

কালভে-কাহিনী থেকে বার্নহার্ড-কাহিনীতে সরে গিয়েছিলাম, ইচ্ছে করেই। তৎকালীন পৃথিবীর প্রধানা অভিনেত্রী ও প্রধানা গায়িকা—উভয়েই স্বামীজীকে দেখেছেন। আমরা দেখলাম, সারা বার্নহার্ডের কাছে স্বামীজী আপাতত আকর্ষণীয় এক ব্যক্তিত্ব ছাড়া আর কিছু নন। বার্নহার্ড ভারতবর্ষে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অনেক কৌতূহলী ইচ্ছার মতো সে ইচ্ছাও উৎসাহের অভাবে অপূর্ণ থেকে যায়। ভারতবর্ষ বার্নহার্ডকে গভীরে ডাক দেয়নি, কিন্তু ডেকেছিল কালভেকে, কেননা ধর্ম তাঁর জীবনে নিত্যস্রোত, আর বিবেকানন্দ তারই আধার-পুরুষ। বিবেকানন্দ যখন কালভের অতিথি হয়ে গ্রীস, তুরস্ক ও মিশর ভ্রমণ করতে রাজি হলেন তখন কালভে নিজেকে ধন্যজ্ঞান করেছিলেন। দলে আরও ছিলেন—জুল বোয়া, পিয়ের হিয়াসান্থ ও তাঁর পত্নী, এবং মিস ম্যাকলাউড। কালভের কাছে এ হল আত্মার তীর্থযাত্রা। কিন্তু বাইরের পৃথিবীর কাছে দারুণ রসালো সংবাদ, কারণ গায়িকা-সম্রাজ্ঞী

ভ্রমণে বেরিয়েছেন অপরিচিত রহস্যময় দেশের এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে।

এই ভ্রমণ তৎকালীন সামাজিক জীবনে কী দারুণ চাঞ্চল্য ও কানাকানির বিষয় হয়েছিল তা দেখা যায় নিউইয়র্ক ওয়ার্লড্ পত্রিকার ১১ নভেম্বর ১৯০০ সংখ্যায়। একেবারে পাতাজোড়া উত্তেজিত বিবরণ, তা অধিকন্তু সচিত্র। কার্টুন-ছবিতে দেখা যায়, কালভে মরুভূমির উপর দিয়ে উটের পিঠে চলেছেন, উটের লাগাম ধরে মরুবাসী আরব বেদুঈন। উপরে ডান দিকে ব্রাকেটের মধ্যে কালভের এবং নীচে বাঁ দিকে স্বামীজীর ছবি।

দূর নিউইয়র্কের উন্মুখ শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য রবিবারের ওয়ার্লড্ পত্রিকার প্যারিসস্থ সংবাদদাতা যে-মুখরোচক চানাচুরী সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, তাতে টক নুন ঝাল যথেষ্টই ছিল এবং সত্যের সঙ্গে মিথ্যার অদ্ভুত মিশাল। সংবাদের সূচনাটা এইরকম :

STRANGEST OF PILGRIMAGES—CALVE'S FLIGHT FOR HEALTH TO THE MYSTIST

Brilliant Singer Abandons Her Stage Career
And Seeks The Shrine Of Buddha
With Mrs. Francis H Leggett Of New York
And Princess Demidoff Under Charge
Swami Vivekananda, Whose Occult Soirees
At Paris House Of The Leggetts
Have Been A Social Sensation.

অর্থাৎ—

বিচিত্রতম তীর্থযাত্রা। স্বাস্থ্যোদ্ধার বাসনায় কালভের মিস্টিকদের কবলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। অসাধারণ গায়িকা তাঁর মঞ্চজীবন ত্যাগ করে বুদ্ধের মঠে আশ্রয়প্রার্থিনী। সঙ্গে

আছেন নিউইয়র্কের মিসেস ফ্রান্সিস লেগেট এবং প্রিন্সেস ডেমিডফ। পরিচালক স্বামী বিবেকানন্দ, লেগেটদের প্যারিস-ভবনে যাঁর রহস্যচর্চার জমায়েতগুলি সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে চাঞ্চল্যকর ব্যাপার।

ব্যাপারটা চাঞ্চল্যকর হতেই পারে কারণ অন্য কেউ নন, এমা কালভে প্রাচ্যগুরুর সঙ্গে ধর্মযাত্রায় যাচ্ছেন!! কালভে—তিনি কী ছিলেন সেকালে?—

"সার্জনের ছুরিই ছিল [কালভের পক্ষে] একমাত্র নিরাময়ের অস্ত্র। অপেরা-জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্মেন কালভে, বহু বৎসর ধরে ভয়ানক মৃত্যুর সম্ভাবনা যাঁর জীবনকে কালো করে রেখেছে—সার্জনের ছুরি থেকে তিনি ছিটকে বেরিয়েছেন নিজ স্বভাবের প্রচণ্ড আবেগের উষ্ণ শক্তিতে—আশ্রয় নিয়েছেন এবং পরিত্রাণ চাইছেন প্রাচ্যের রহস্যশক্তির কাছে। পালতোলা নৌকায় যাচ্ছেন স্মার্নায়। সুলতানের সামনে গাইতে পারেন। উষ্ট্রপৃষ্ঠে মরুভূমি অতিক্রম করবেন তিনি। তারপর দীর্ঘ বিচিত্র যাত্রার শেষে পৌঁছবেন হিমালয়ের তুষাররাজ্যে। প্রত্যেক পর্যায়ের উপযোগী সাজপোশাক তাঁর সঙ্গেই আছে।"

পুনশ্চ:

"সার্জনের ছুরিকা থেকে পলাতকা মাদাম কালভে প্রাচ্য-রহস্যের মধ্যে নিমজ্জিত হবার জন্য তাঁর অপেরার সকল চুক্তিভঙ্গ করেছেন এবং খ্রীস্টান-জগতের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছেন।

"কার্মেন ভূমিকায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী, মঞ্চমধ্যে বাসনার মহাদেবী,

দক্ষিণ ফ্রান্সের উত্তপ্ত রক্ত এবং শিল্পীস্বভাবের তীব্র আবেগে আলোড়িত কালভে— শারীরিক যন্ত্রণা ও সম্ভাব্য মৃত্যুর আতঙ্ক তাঁকে পৃথিবীর সুদূর নানা স্থানে তাড়িত করে নিয়ে যাচ্ছে, গুপ্ত রহস্যবিদ্যার কাছে তিনি পরিত্রাণ চাইছেন, যে-ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান তাঁকে সার্জনের ছুরি ছাড়া অন্য কোনো বিধান দিতে সমর্থ নয়।

"কালভে আবেগ-কন্যা, রক্তমাংসের মানবী, বেপরোয়া বেহিসেবী, জিপসী-স্বভাব গায়িকা, বাসনা শুধু বাসনা আর উত্তেজনা—কার্মেনদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—কারণ স্বয়ং কার্মেন। কিন্তু এখন আর বেপরোয়া নন তিনি। এখন ভাগ্যহত, জর্জরিত, আতঙ্কিত। জীবনের সকল উল্লাস এখন সার্জনের ছুরির চিন্তায় শিহরিত। তাঁর বিপুল প্রাণশক্তি, আত্মশাসনে অসামর্থ্য—সেই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর প্রধান শত্রু। তাঁর কল্পনাপ্রবণ মন অস্ত্রোপচার ব্যাপারটিকে অকল্পনীয় ভীতির ঘোরবর্ণে তাঁর কাছে চিত্রিত করেছে।"

"এই চমকপ্রদ অভিযানে তাঁর দিশারী, দার্শনিক, ও বন্ধু হলেন পণ্ডিত ও সুদর্শন হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি এই দেশে [আমেরিকায়] বিশ্বমেলার বছরে বক্তৃতা করে অনেককে স্বমতে এনেছিলেন।

"এই লেখা যখন পঠিত হবে তখন নিঃসন্দেহে আত্মনির্বাসিত গায়িকা-প্রধানা এবং তাঁর কৃষ্ণবর্ণ শিক্ষক উষ্ট্রপৃষ্ঠে স্মার্না থেকে জেরুজালেম যাবার জন্য মরুভূমির উপর দিয়ে চলেছেন, অবশ্যই ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের সর্ববিধ আয়োজন সেই সঙ্গে থাকবে, যা আধুনিক 'কুইন অব সেবা'-এর যোগ্য। বিচিত্র পরিকল্পনা এই রকমই।

"কালভে এবং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে থাকবেন রাশিয়ার

প্রিন্সেস ডেমিডফ, নিউইয়র্কের মিসেস ফ্রান্সিস এইচ লেগেট ও তাঁর বোন মিস ম্যাকলাউড। এর থেকে অদ্ভুত মনুষ্য-সমাবেশ সম্ভব নয়। বিবেকানন্দের ব্যাপার, লেগেটদের উপর তাঁর প্রভাব, লেগেটরা কিভাবে প্রিন্সেস ডেমিডফের মতো সোসাইটিতে প্রচণ্ড প্রতিপত্তিশালিনী নারীর সংস্পর্শে এলেন তার কাহিনী, সেই সঙ্গে কালভের মতো সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে যোগাযোগের বিবরণ—আধুনিক প্যারিসের এই কথাকাহিনীর ক্লাইম্যাক্সে আছে, উটের গলায় ঝোলানো ঘণ্টার শব্দ—একেবারে বালজাকের যোগ্য রচনা যেন।"

সত্যের বিচিত্র মূর্তি এবং ভাগ্যের পরিহাস। সাংবাদিকদের কাছে পাঠকই প্রভু। পাঠকের রুচির প্রয়োজনে এঁরা যে-কোনো কাজ করতে প্রস্তুত থাকেন প্রায় সর্বদাই। তাই এই বিকট অন্যায় কাজটি এঁরা বারে বারে করেছেন—গুপ্ত রহস্যবাদের সবচেয়ে বড় শত্রুকে গুপ্ত রহস্যবাদী বলে প্রচার করেছেন। স্বামীজী গুপ্ত রহস্যবাদকে পৃথিবীর সবচেয়ে ওঁচা কুসংস্কার মনে করতেন। 'যে লোক টাকার পিছনে কেবল ছোটে সে ইতর। কিন্তু যে লোক রহস্যবাদী গুপ্ত ক্রিয়াকলাপের পিছনে ছোটে সে ডবল ইতর। ও-জিনিসটা নোংরা। কড়ে আঙুল দিয়েও ছুঁতে নেই।'

কালভেকে তাই স্বামীজী-প্রসঙ্গে জোর দিয়ে বলতে হয়েছিল—তিনি উত্তোলন করতেন চরিত্রের তেজে, পবিত্রতার শক্তিতে। শিশুর মতো পবিত্র মানুষটিকে নিয়েও নীচ কণ্ঠ কানাকানি করেছে—কালভে ঘৃণায় বেদনায় শিউরে উঠেছেন। পাশ্চাত্যের অনেক বুদ্ধিজীবীর মধ্যে লঘু কৌতূহল, কুট সন্দেহ—অবিশ্বাসের তারিয়ে চাখা সুখে তৃপ্ত তারা। এই ভ্রমণে স্বামীজীর অন্যতম সঙ্গী সাহিত্যিক জুল বোয়া—স্বামীজীর প্রতি

তাঁর শ্রদ্ধার শেষ নেই, স্বামীজী তাঁর কাছে বুদ্ধ, এপিকটেটুস্ ও মার্কাস অরেলিয়াসের মিলিত মূর্তি—তিনিও বিবেকানন্দকে প্রলুব্ধ করবার জন্য কালভেকে উস্কানি দিয়েছিলেন, কেননা হয়ত নিজের সাহিত্যিক স্বভাবে বিশ্বাস করেছিলেন, উর্বশী উপস্থিত হলে 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল।' কালভে চমকে শিউরে উঠেছিলেন, তারপর বলেছিলেন 'বিবেকানন্দের মধ্যে ঈশ্বর আছেন। তাঁকে নমস্কার করি আমি।'

১৯০০ সালে স্বামীজীর সঙ্গে এই ভ্রমণ কালভের জীবনে 'অবিস্মরণীয়।' বলেছেন, 'তা আমার জীবনের সর্বোত্তম কাল।' 'স্বামীজীর নিকটে থাকার অর্থ অবিরাম প্রেরণার মধ্যে থাকা। ঐ কালে আমরা গভীর তীব্র আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার মধ্যে বাস করেছি। যে-কোনো ব্যাপারই তাঁর মুখে এনে দিত কথাগল্প, নীতিকাহিনী এবং নানা উদ্ধৃতি, যা হিন্দু পুরাণ থেকে শুরু করে গভীরতম দর্শন পর্যন্ত সকল শাস্ত্র হতে সংগৃহীত। কখনো কখনো তিনি অত্যন্ত স্ফূর্তিতে থাকতেন, কৌতুকের শেষ থাকত না, দ্রুত ধারালো উত্তর ঝলসে উঠত। একেবারে শিশুর মতো হাসিতে খুশিতে লুটোপুটি। কণ্ঠস্বর চেলো-বাদ্যের মতো [বেহালা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র]—নীচু পর্দার তরঙ্গ বক্তৃতাসভার শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে প্রতিটি হৃদয়কে পূর্ণ করে দিত। সে-জিনিস ভোলা সম্ভব নয়।' 'কিংবা ব্যারিটোন গায়কের কণ্ঠস্বর, তা স্পন্দিত হত চীনা ঘণ্টাধ্বনির মতো।'

কালভে এই 'অবিস্মরণীয়' ভ্রমণের বিষয়ে আত্মজীবনীতে বলেছেন :

"সে কি তীর্থযাত্রা! বিজ্ঞান দর্শন এবং ইতিহাসের কোনো রহস্যই স্বামীজীর কাছে অনালোকিত নয়।···চমৎকৃত হয়ে দেখেছি, ফাদার হিয়াসান্থের মতো খ্যাতনামা ধর্মতাত্ত্বিকও যেখানে সঠিকভাবে একটি চার্চ-কাউন্সিলের তারিখ বলতে পারলেন না—স্বামীজী সেখানে মূল দলিল অবিকল মুখস্থ বলে গেলেন।"

"গ্রীসে থাকাকালে ইউলিসিস দর্শন করলাম। স্বামীজী আমাদের কাছে তার রহস্য ব্যাখ্যা করলেন। আমাদের নিয়ে গেলেন এক বেদী থেকে আর এক বেদীতে, এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে। কোথায় কোন্ ধর্মীয় শোভাযাত্রা হত, ব্যাখ্যা করলেন। প্রাচীন প্রার্থনামন্ত্র আবৃত্তি করে শোনালেন। দেখালেন পুরোহিতগণের পূজাপ্রণালী।

"তারপরে এক অবিস্মরণীয় রাত্রিতে মিশরের মৌন ফিঙ্কসের ছায়াতলে বসে তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন সুদূর অতীতে—আলোড়িত রহস্যময় ভাষার উদ্‌ঘাটন করলেন কত ইতিবৃত্ত।"

স্বামীজীর ছিল 'যাদুকণ্ঠ।' সম্মোহিত করে রাখতেন শ্রোতাদের। স্টেশন-ওয়েটিংরুমে বসে তাঁর কথা শুনতে-শুনতে সময়বোধ হারিয়ে যেত, কতবার তাঁরা এইভাবে ট্রেন মিস্ করেছেন ঠিক নেই।

এমনই এক আত্মহারা ক্ষণে মাদাম কালভে দেখেছিলেন স্বয়ং আবির্ভূত পরিত্রাতাকে!

"একদিন কায়রোয় আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। মনে হয়, খুবই মগ্ন হয়ে আমরা কথাবার্তা বলেছিলাম। যেভাবেই তা ঘটুক, আমরা সচেতন হয়ে দেখলাম, একটি নোংরা, কটুগন্ধ পথে হাজির হয়েছি, যেখানে অর্ধনগ্ন নারীদের কেউ জানলা থেকে উঁকি দিচ্ছে, কেউ-বা দরজা-গোড়ায় হাত-পা ছড়িয়ে এলিয়ে বসে আছে।

"স্বামীজী পরিবেশ বিশেষ লক্ষ্য করেন নি, যতক্ষণ-না একটা জীর্ণ বাড়ির ছায়ায় বসে-থাকা একদল অত্যন্ত প্রগল্‌ভ নারী খিলখিল হেসে তাঁকে ডাকাডাকি করেছিল। আমাদের দলের জনৈক মহিলা তাড়া-তাড়ি ওখান থেকে আমাদের সরিয়ে নিয়ে যেতে ব্যস্ত হলেন। কিন্তু স্বামীজী মৃদুভাবে নিজেকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে বেঞ্চে বসে থাকা মেয়েগুলির দিকে এগিয়ে গেলেন।

'হায় হতভাগিনীরা! হতভাগ্য সন্তানেরা! এরা নিজেদের ঈশ্বরত্বকে টেনে নামিয়েছে দেহের রূপে! দেখো একবার ওদের!'

"তিনি কাঁদতে লাগলেন—যে কান্না প্রভু যীশুও কাঁদতে পারতেন ব্যভিচারিণী নারীদের সামনে।

"মেয়েগুলি স্তব্ধ হয়ে গেল, অত্যন্ত অপ্রতিভ। তাদের একজন নতজানু হয়ে তাঁর বসনপ্রান্ত চুম্বন করে ভাঙা-ভাঙা স্প্যানিশে অস্ফুটে বলতে লাগল, 'ঈশ্বরপুত্র! ঈশ্বরপুত্র!' অন্য একজন সহসা লজ্জায় আতঙ্কে অভিভূত হয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল। সে যেন ঐ পবিত্র আঁখির দীপ্তি থেকে নিজের সংকুচিত আত্মাকে ঢেকে রাখতে চাইছিল।"

কালভে-কাহিনী শুরু করেছিলুম যেখান থেকে সেখানে একবার পাঠকদের ফিরিয়ে নিয়ে যাব। বলেছিলুম, স্বয়ং ভাইসরয়ের দ্বারা সংবর্ধিত কালভে পরাধীন দেশের এক সন্ন্যাসীর সমাধির সন্ধানে তীর্থ-যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। সে সন্ন্যাসী যে স্বামী বিবেকানন্দ তা এখন আর কাউকে বলে দিতে হবে না।

ইংলিশম্যান কাগজের ২৩শে নভেম্বর, ১৯১০ সংখ্যার সাক্ষাৎকার বিবরণেই কালভের বিবেকানন্দ-ভক্তির কথা ছিল। উন্নাসিক ইংরাজ সাংবাদিক শুনে চমৎকৃত হয়েছিলেন, কালভের মতো বিশ্ববন্দিত ফরাসি গায়িকা একজন কালা সন্ন্যাসীর প্রতি অত্যুচ্চ শ্রদ্ধার ভাষায় কথা বলছেন। তিনি শুনলেন, এই আশাভরসাহীন হতভাগ্য দেশের সম্বন্ধে গায়িকা-প্রধানার মনে গভীর উৎসুক্য জাগাতে পেরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের বাণীর প্রতি তাঁর এমনই অনুরাগ যে, স্বামীজীর একটি বই ফরাসিতে অনুবাদ করিয়েছেন—'নিজ জাতির জন্য।' ইংরাজ সাংবাদিক সবিস্ময়ে শুনলেন, সঙ্গীতরাণী তাঁর গানের গুরুর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের নাম এক নিঃশ্বাসে বলছেন।

> How did the idea of visiting India enter her [Mdme. Calve's] mind ?

"I wanted to see the country. I am very much interested in the religions of India and in her customs. [Then in French] I wanted to see the country for myself."

Strange as it may sound Madame Calve is visiting India for, a change for rest. The three months which she has set aside for her tour in the East are to be passed in doing nothing, with the exception of a few concerts here and there. Her curiousity about the Land of Regrets was aroused by Swami Vivekananda when he visited the Congress of Religions at Paris [America]. She again met the Swami in America [Paris]. He made a great impression on Madame Calve, who was instrumental in having one of his works translated into French—'for my nation, the French people,' as Madame put it. How much the great artiste thinks of Swami Vivekananda, can be imagined when she thinks his name with that of her teacher, Rossina Laborde."

ইংলিশম্যানের রচনাটি পড়ে কিছু ভারতীয়ও চমকিত হলেন। তাঁদের মধ্যে কলকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির সদস্যরাও ছিলেন। তাঁদের কয়েকজন তৎপর হয়ে গ্রাণ্ড হোটেলে হাজির হলেন, কালভেকে দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠ দর্শনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। তারপর কী ঘটল তার চমৎকার বিবরণ পাই প্রত্যক্ষদর্শী কুমুদবন্ধু সেনের লেখায়। তার অংশ :

"আমরা সকলেই ['প্রাসাদোপম গ্রাণ্ড হোটেলের সুসজ্জিত কক্ষে'] মাদামের আগমন প্রতীক্ষায় রইলাম। অবিলম্বে দুটি ভদ্রলোককে

সঙ্গে করে ভিতরের কক্ষ থেকে মাদাম কালভে আমাদের সম্মুখে হাস্য মুখে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে আমরা যখন সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠলাম, তখন তিনি আমাদের অভিবাদন করে ওষ্ঠে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করে বললেন, 'নথ্ ইংলিশ।' মাদামের সঙ্গী দুজনের মধ্যে একজন....বললেন, 'মাদাম ইংরাজি জানেন না, এইজন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখবোধ করছেন, তাঁর মনের ভাব তিনি আপনাদের জানিত ভাষায় প্রকাশ করতে পারছেন না। আমি দোভাষী হয়ে আপনাদের কথা তাঁকে জানাব এবং তাঁর কথা আপনাদের জানাব।' আমাদের মুখপাত্র-স্বরূপ পূর্ণবাবু [শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য পূর্ণচন্দ্র ঘোষ] কথা আরম্ভ করলেন। তিনি প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ফটোগুলি মাদামকে উপহার দিলেন। মাদাম সহাস্যবদনে সেগুলি নিজের হাতে গ্রহণ করে, শ্রীরাম-কৃষ্ণের ফটো দেখে অতি শ্রদ্ধাভরে মস্তকে স্পর্শ করলেন। পরে টেবিলের উপরে রাখলেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ফটো দেখে তিনি যেন আনন্দের বেগে আত্মহারা হয়ে গেলেন। স্বামীজীর ফটো তিনি বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। মুখে চোখে সর্বশরীরে আনন্দের দীপ্তি উদ্ভাসিত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অতি আনন্দপূর্ণ দৃষ্টিতে রুদ্ধকণ্ঠে ভাঙা ইংরাজিতে বললেন, 'Oh! I am very very happy।' তারপর অনর্গল ফরাসি বলতে লাগলেন এবং আমাদের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। সেই দৃষ্টি যেন স্পষ্ট করে বলল, কি দুঃখ! আমার এই মনের ভাবগুলি তোমাদের জানিত ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। দোভাষী, মাদামের ভাবগুলি যেন ব্যক্ত করতে অক্ষম—তিনিও শ্রদ্ধানত হৃদয়ে বললেন, 'মাদাম ভাবে বড় অভিভূত হয়ে পড়েছেন। তাঁর পুরণো স্মৃতি সব জেগে উঠছে। স্বামীজীর এই ছবি দেখে মাদাম স্বামীজীকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন।' দোভাষীর কথা শেষ হতে না হতে মাদাম অনর্গল ফরাসি ভাষায় তাঁর মনের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করতে লাগলেন। তখনো

তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ফটো বক্ষে চেপে রেখেছেন। দোভাষী হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন। মাদাম কালভে নিজেই মনের আবেগে ভাঙা ইংরাজিতে বলতে লাগলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ যীশু-খ্রীস্টের মতো ছিলেন। যীশুর ন্যায় তাঁর সরলতা ছিল। যীশুর মতো তাঁর জীবন প্রেমপূর্ণ পবিত্র সরস ছিল।' কথা বলতে বলতে আবার ফরাসি ভাষায় বলতে লাগলেন। দোভাষী বললেন, মাদাম বলছেন, তাঁর জীবনের শুভ মুহূর্তে তিনি স্বামীজীকে দর্শন করেছিলেন। তিনি পাঁচ বছরের ছেলের মতো পবিত্র দিলেন। তাঁর সঙ্গেও লোক পবিত্র হত। ভগবৎশক্তির প্রকাশমূর্তি বিবেকানন্দ ছিলেন। তাঁর কী প্রবল আকর্ষণ ছিল, সে রকম আকর্ষণ আমি জীবনে অন্য কোথাও বোধ করিনি। কতদিন তাঁর কথা শুনতে শুনতে এত তন্ময় হয়ে গেছি যে, কখন আমার স্পেশাল ট্রেন এল, কখন চলে গেল, কিছু লক্ষ্য ছিল না। তাঁর পবিত্র সঙ্গের জন্য শুধু একবার নয়, বহুবার আমাকে অর্থ-দণ্ড দিতে হয়েছে। কিন্তু তা আনন্দের সঙ্গে দিয়েছি। কি বিশাল প্রেম-পূর্ণ হৃদয়! কি অদ্ভুত পবিত্রতা। কি মোহন আকর্ষণ। কি মর্মস্পর্শী বাণী। কি অপূর্ব তেজঃপুঞ্জ মূর্তি। কি সুন্দর বিশাল আকর্ষণবিস্তৃত চক্ষু!' দোভাষীরও চক্ষু সজল হয়ে উঠল। মাদাম আবার ফরাসি ভাষায় তাঁর আকুল আকূতি, আনন্দের আবেগ জানালেন। যদিও ভাষা আমাদের অবোধ্য · কিন্তু গভীর ভাবোচ্ছ্বাস·· শ্রোতাদের···অন্তরের সুরে-সুরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।-- সেই বিলাসসজ্জিত কক্ষ তখন শ্রদ্ধা ও পূজার বিরাট আবহাওয়ায় ভরে গিয়েছিল।"

মাদাম কালভে স্বতঃই বেলুড়ে স্বামীজীর সমাধিমন্দির দর্শনের জন্য আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। বেশ কয়েকজন ফরাসি-ফরাসিনীর সঙ্গে কালভে মঠে যান। ২ ডিসেম্বর ১৯১০, অপরাহ্ণে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান মঠের কর্মাধ্যক্ষ স্বামী সারদানন্দ, যাঁর সঙ্গে কালভের ঈষৎ পূর্বপরিচয় ছিল। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতরাণীকে ভারতীয় সঙ্গীত শোনাবেন

বলে সারদানন্দ পূর্বাহ্ণে 'সুপ্রসিদ্ধ বংশীবাদক' হাবু দত্তকে সদলে মঠে আনিয়েছিলেন। তারপর—

"মাদাম সর্বাগ্রে স্বামীজীর সমাধিস্থান দেখতে চাইলেন। স্বামী সারদানন্দস্বামীজীর সমাধিমন্দিরের সম্মুখে নিয়ে গিয়ে বললেন – 'এই স্থান।' মাদাম কালভে অতি শ্রদ্ধাভরে সেই মন্দিরে প্রবেশ করলেন [মন্দির তখন নির্মীয়মাণ]। অপর সাহেব মেমরা তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করে পাঁচ মিনিট পরে বাইরে এলেন, কিন্তু মাদাম ভিতরে রইলেন। আমরা বাইরে থেকে দেখতে পেলাম, মাদাম স্বামীজীর প্রস্তরমূর্তির সম্মুখে নতজানু হয়ে রয়েছেন। সকলেই নীরব।···দেখতে-দেখতে পনর মিনিট চলে গেল, মাদাম সেইভাবে নতজানু হয়ে রয়েছেন—চোখে মুখে গণ্ডে পবিত্র অশ্রুধারা বেয়ে পড়ছে।···পরে মাদাম ধীরে-ধীরে সে মন্দির থেকে বাইরে এলেন। স্বামী সারদানন্দ-মহারাজকে অগ্রণী করে মাদাম ফরাসি মহিলা ও ভদ্রলোকদের সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরঘরে গেলেন। ·· সেখানে মাদাম কালভে যখন নতজানু হলেন তখন তাঁর সে গাম্ভীর্য নেই, তখন তিনি হাস্যময়ী আনন্দোৎফুল্লা। স্বামা সারদানন্দজীকে বললেন, 'স্বামীজী একটি বৈদিক প্রার্থনা বলতেন, তার মানে, অন্ধকার থেকে আমাদের আলোকময় পথে নিয়ে চলো—যদি সেটি জানেন তবে সেই প্রার্থনা এখানে বলুন। আমার অত্যন্ত শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।' স্বামী সারদানন্দ তাঁর সুমধুর গম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন—

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

সকলেই মুহূর্তে যেন স্বতঃই ধ্যানস্থ হলেন। পরে পূজনীয় সারদানন্দ স্বামী মাদাম কালভেকে সম্বোধন করে বললেন, 'মাদাম! ঠাকুরকে আপনি এখানে গান শোনাবেন না?' মাদাম শ্রদ্ধানত হয়ে হাস্যমুখে স্বামী সারদানন্দজীর আদেশ গ্রহণ করলেন···কলকণ্ঠে ফরাসি সঙ্গীত

গাইলেন। যদিও সে সঙ্গীতের অর্থ আমাদের অবোধ্য, কিন্তু কি মধুর স্বরলহরী, যেন হঠাৎ হাজার বুলবুল ঝঙ্কার দিয়ে উঠল,···যেন সেই স্বরলহরী মঠের স্নিগ্ধ-গম্ভীর বায়ুস্তরকে কম্পিত করে, আন্দোলিত করে এক আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত করলে।···মাদাম পরপর দুটি গান গাইলেন।”

ঠাকুরঘর থেকে নেমে আসার পরে সকলে ঠাকুরঘরের সামনের প্রাঙ্গণে বসেছিলেন। মঠের সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হাবু দত্তের এস্‌রাজ ও ক্ল্যারিওনেট শুনে তিনি খুব তারিফ করেছিলেন। দেশী গং শুনে সেগুলি ইংরাজি নোটেশনে পাবার ইচ্ছা করেছিলেন, যাতে পরবর্তী লণ্ডন মরশুমে তা গাইতে পারেন। হাবু দত্তকে তিনি গ্রেট আর্টিস্ট আখ্যায় অভিহিত করেন। মঠেই স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তকে দেখেন ও তাঁর বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বিদায়কালে কুমুদবন্ধু ও মহেন্দ্রনাথকে পরদিন তাঁর কনসার্টে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে যান।

কালভের সেই সঙ্গীতের আসর কিন্তু হয়নি। মঠ থেকে ফেরার পথে ঠাণ্ডা লেগে তাঁর সর্দি হয় এবং অসুস্থতার জন্য অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে যায়। গ্রাণ্ড হোটেলে কুমুদবন্ধুরা যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান, তখন শয্যাশায়িত মাদাম কালভে বেরিয়ে এসে দেখা করতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর অনুরোধে এঁরা শয়নকক্ষে গিয়ে দেখা করেন।

“আমরা ধীরে-ধীরে মাদাম কালভের শয্যাগৃহে প্রবেশ করলাম। একটি পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপরে তিনি শায়িত ছিলেন। আমরা নত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে দাঁড়ালাম। তিনি মহীনবাবুকে দেখে ভাঙা-ভাঙা ইংরাজিতে বললেন, ‘আপনি এসেছেন, বড় সুখী হলাম। মঠ থেকে ফিরে আসবার সময়ে ঠাণ্ডা লেগে বড় সর্দি হয়েছে। আজ বম্বে মেলে কলকাতা ত্যাগ করব।’ এই বলে অর্ধশায়িতভাবে বালিশে হেলান দিতে উঠলেন। সেই সময়ে দেখতে পেলাম, স্বামীজীর ফটো-

গুলি, যা আমরা বিবেকানন্দ সমিতি থেকে তাঁকে উপহার দিয়েছিলাম, বিছানায় ছড়িয়ে পড়ল। পীড়িত অবস্থায় তিনি তাঁর নির্জন শয্যাকক্ষে ছবিগুলি বক্ষের উপর রেখে দিয়েছিলেন—তাই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম।···মাদাম কালভে ধীরে-ধীরে সেই ছবিগুলি একে একে দেখে আবার তাঁর বক্ষের উপর রাখলেন, পরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি আনন্দে কাল বেলুড় মঠে কাটালাম। বড় আনন্দ পেয়েছি—কালকে আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন ছিল, কখনো ভুলতে পারব না।' আমি বললাম, 'মাদাম, যদি কাল একটু আগে আসতেন তবে বোধহয় এই অসুখ হত না।' মাদাম বললেন, 'এই সর্দিতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইনি। কাল মঠে যেন একটি সঙ্গীতের সুরের মতো, কবিতার কাব্যলোকের মতো কেটেছে। স্বামীজীর সমাধিস্থান দর্শন করেছি। মঠের স্বামীজীর গুরুভ্রাতাদের দর্শন করেছি। কি পবিত্র শান্তিময় স্থান।·· স্বামীজীর কথা আর কি বলব—তাঁর ধ্যানে, তাঁর বাণীতে মানুষ নতুন জীবন গড়ে তুলতে পারে। জগতের পতিত দুর্বল পদদলিত দরিদ্র ব্যথিতদের জন্য কী অগাধ প্রেম। বর্তমানকালে তিনি খ্রীস্টের মতো মানবজাতির পরিত্রাতা।"

বেলুড় মঠ দর্শন কালভের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। আত্মজীবনীতে দিনটির স্মরণ করে লিখেছেন :

"স্বামীজীর সংঘের সন্ন্যাসীরা আমাদের সহজ সহৃদয় আতিথ্যে গ্রহণ করেছিলেন। তৃণাস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে স্নিগ্ধ বৃক্ষছায়ার নীচে টেবিল পাতা ছিল—সেখানে আমাদের তাঁরা ফুল উপহার দেন, ফলমূল খেতে দেন। সামনে প্রবাহিত ছিল বিশাল গঙ্গা। বাদ্যকরেরা বিচিত্র যন্ত্রে রহস্যময় সকরুণ সুর বাজিয়েছিলেন, হৃদয়-গভীরকে স্পর্শ করেছিল তা। স্বামীজীর স্মরণে জনৈক কবি আবৃত্তি করলেন স্বরচিত আর্ত কবিতা। অপরাহ্ণ অতিবাহিত হল প্রসারিত ধ্যানশান্তির মধ্যে।

"এইসব প্রশান্ত সাধুদের সঙ্গে যে কয়েক দণ্ড কাটিয়েছিলাম, তারা

আমার স্মৃতিতে রয়ে গেছে স্বতন্ত্র কাল-খণ্ড রূপে। এই মানুষগুলি]
পবিত্র, সুন্দর, সুদূর, যেন অন্য কোনো জগতের, কোনো শুভতর
শ্রেয়তর জগতের।"



আমি শুধু মাতা

স্বামী বিবেকানন্দ মাদাম কালভে সম্বন্ধে লিখেছেন :

"মাদ্‌মোয়াজেল কালভে আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা।··· অসাধারণ রূপ, যৌবন, প্রতিভা, আর দৈবী কণ্ঠ—এসব একত্র সংযোগে কালভেকে গায়িকামণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়া করেছে।"

স্বামীজী আরও বলেছেন :

"কালভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চা করেন তা নয়, বিদ্যা যথেষ্ট ; দর্শন-শাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন। অতি দরিদ্র অবস্থায় জন্ম হয়।···শৈশবের অতি কঠিন দারিদ্র্য, দুঃখ, কষ্ট, যার সঙ্গে দিবারাত্র যুদ্ধ করে কালভের এই বিজয়লাভ—সে সংগ্রাম তাঁর জীবনে এক

অপূর্ব সহানুভূতি, এক গভীর ভাব এনে দিয়েছে।”

আমরা দেখেছি, কালভের সংগ্রাম শুধু বাইরের বিরোধিতার সঙ্গে নয়—নিজের সঙ্গেও। বাইরের দুর্বিপাকের সঙ্গে লড়াই করে তিনি জয়ী হয়েছেন, ‘রাজা বাদশার সম্মানের ঈশ্বরী’, কিন্তু নিজের কাছে পরাজয় ঘটেছে বারবার। রাজা-বাদশার সম্মানও তাঁর হৃদয়ের শূন্যতা পূরণ করতে পারেনি। প্রেমে ব্যর্থ তিনি। চেয়েছিলেন, মঞ্চের অত্যুজ্জ্বল আলোক থেকে সরে গিয়ে যখন ঘরে পৌঁছবেন, সেখানে থাকবে স্নিগ্ধ দীপালোকিত শান্তির সংসার – না, তা পাননি। নিজের গ্রাম-দেশে শৈশবস্বপ্নের দুর্গপ্রাসাদটি কিনেছিলেন এই আশা নিয়ে—সঙ্গীত মরশুমের শেষে সেখানে ফিরে গিয়ে পাবেন আলোড়নের জীবনের অন্তে স্নেহের আশ্রয়। “আমার দেশকে আমার চাই, আমার ঘরকে। …ঐ দুর্গভবনটি আমার জীবনের অংশ।” অবসর নিয়ে যখন সঙ্গীত-শিক্ষিকার জীবনকে গ্রহণ করেছেন, তখন ছাত্রীদের দ্বারা ভরে থাকত এই দুর্গপ্রাসাদ, কত আনন্দের সঙ্গে সেকথা বলেছেন, কিন্তু বলেন নি—তা সত্ত্বেও সে ভবন কতখানি শূন্য ছিল। আমরা অনুমান করতে পারি। ঐ প্রাসাদে ছিল না কালভের পুত্র বা কন্যা, যে একটি-দুটি মানুষ বিশাল ভবনকে ভরিয়ে রাখতে পারে।

কন্যা—কন্যাই ছিল কালভের সর্বস্ব। সন্তানহারা জননীর দুঃখের চেয়ে বড় দুঃখ আর নেই। তাই যেখানেই সন্তানের কথা এসেছে—কালভে বেজেছেন গভীর সুরে।

আমি মাতা—হাহাকার করে বলেছে তাঁর অন্তরাত্মা। যখনই দেখেছেন, কোথাও মা কাঁদছে লুটিয়ে—সেখানে গেছেন ব্যথাভরা হৃদয় নিয়ে, যদি সহানুভূতিতে শোষণ করে নেওয়া যায় শোকের কিছুটা।

তেমনি দু’একটি ঘটনা দেখা যাক।

ইংলণ্ডের উইণ্ডসর ক্যাসলে ফ্রান্সের একদা সম্রাজ্ঞী ইউজেনীকে মাদাম কালভে দেখেছিলেন। আর তখনি ইতিহাস কানাকানি করে উঠেছিল।

বৃদ্ধা বিধ্বস্তা এই নারী একদিন সমস্ত ইউরোপের মুগ্ধ দৃষ্টির আলোকে উদ্‌ভাসিত ছিলেন। বেশ কিছু বছর ধরে এঁর স্বামী এবং ইনি ইউরোপের রাজ্যগুলির ভাগ্য নিয়ে খেলা করেছিলেন।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ভাইপো লুই নেপোলিয়ান - 'নেপোলিয়ান' নামক বিরাট নাম এবং উক্ত নাম-সংশ্লিষ্ট বিরাট আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে অনিশ্চিত পদে ইউরোপের ইতিহাসের উপর এসে দাঁড়িয়েছিলেন। রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের প্রয়াসে গোড়ায় কয়েকবার ব্যর্থ হলেও পরে গরিষ্ঠসংখ্যক ফরাসি কৃষক-প্রজার নেপোলিয়ান নামের প্রতি মোহময় সমর্থনের শক্তিতে দ্বিতীয় রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন—পরে রিপাবলিককে চূর্ণ করে সম্রাট হয়েছিলেন ফ্রান্সের—১৮৫২ সালের ২রা ডিসেম্বর--সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন।

সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন অসামান্যা এক নারীকে পত্নী নির্বাচিত করেছিলেন। স্পেনের অভিজাত বংশের কন্যা হলেও রাজকুলসম্ভূতা তিনি নন, তথাপি তাঁকেই বিয়ে করেন মন্ত্রিমণ্ডলীর আপত্তি সত্ত্বেও। সম্রাজ্ঞী ইউজেনীর এমনই অপরূপ সৌন্দর্য, আচরণের শালীনতা, মধুর আকর্ষণী শক্তি যে, মুহূর্তে লুঠ করে নিয়েছিলেন ফ্রান্সের হৃদয়, প্রজা-সাধারণ লাখ-লাখ ফ্রাঁ এনে হাজির করল তাঁর রত্নালঙ্কারের জন্য—সে টাকা তিনি দান করে দিলেন শ্রমিক-কল্যাণে।

১৮৫৬ সালে এঁর পুত্র জন্মাল। লক্ষ-লক্ষ ফরাসি তাদের ভাবী ভাগ্য-বিধাতার উদ্দেশ্যে জয়-জয় করল, দেশের প্রান্তে-প্রান্তে কামান গর্জন করল। সবাই জানল—নেপোলিয়ান-বংশের রক্তধারা ধমনীতে নিয়ে জন্মেছে রাজপুত্র – প্রিন্স ইম্পিরিয়াল।

তারপর—

তৃতীয় নেপোলিয়নের রথ ছুটেছে. পাশে আছেন সুভগা সুভদ্রা সম্রাজ্ঞী—গৌরব থেকে গৌরবে উত্থিত তিনি। দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন, বিভিন্ন ইউরোপীয় রাজ্যে মর্যাদার আসন তাঁর জন্য পাতা আছে, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে বলীয়ান তিনি, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রিমিয়ার-যুদ্ধের সফল নায়ক, ইউরোপের প্রধান পুরুষ। আর তাঁর অসামান্য গুণবতী রাণী রচনা করেছেন বিলাসবৈভবে এবং প্রদীপ্ত প্রতিভায় উজ্জল তৎকালীন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ রাজসভা। তৃতীয় নেপোলিয়ন এগিয়ে চলেছেন, থামছেন না,.থামা সম্ভব নয়।

তারপর—

শিখর থেকে রথ গড়িয়ে নামছে এবার। পররাজ্যের দিকে তৃতীয় নেপোলিয়নের হাত ক্রমেই দীর্ঘতর। বহু রাজ্যে বিভক্ত ইতালির অখণ্ডতা-বিধানে গোড়ায় সাহায্য করলেও পরে সমর্থনের হাত গুটিয়ে নিলেন, কারণ ভয়—সংঘবদ্ধ ইতালি ফ্রান্সের সাম্রাজ্যস্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক হ'তে পরে। কিন্তু ইতালি তখন জেগেছে—মাৎসিনীর স্বপ্নে, গ্যারিবল্ডির বীর্যে, কাভুরের রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় এবং রাজা দ্বিতীয় ইমানুয়েলের দৃঢ় বিচক্ষণতায়। অভ্যুদয় হয়েছে প্রায় একসঙ্গে বিসমার্কের নেতৃত্বে প্রাসিয়ার। তাকে সংযত রাখবার মতো অর্থ বা সামর্থ্য যথাসময়ে ফরাসি সম্রাট নিয়োগ করতে পারেন নি, যেহেতু মেক্সিকোয় প্রভাব বিস্তারের বৃথা পরিকল্পনায় শক্তিক্ষয় করেছেন। এখন ক্ষয়িত মর্যাদার পুনরুদ্ধার এবং ইউরোপের শক্তিসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনে প্রাসিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নামা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারপর—

যুদ্ধ বাধল। একদিকে আত্মসন্তুষ্ট অপ্রস্তুত এবং অহঙ্কৃত ফ্রান্স, ভ্রান্ত রাজনৈতিক বুদ্ধিতে চালিত, অন্যদিকে স্থির প্রতিজ্ঞায় উদ্যত, রণদুর্মদ প্রাসিয়া, রাজনীতিজ্ঞানে ক্ষুরধার।

ফল : ক্রমাগত পরাজয়। শেষে—সম্রাট বন্দী, সম্রাজ্ঞী পলাতক,

সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত, সাম্রাজ্য 'ঝড়ের মুখে ভাঙা কুঁড়ের চাল।'

এই ইতিহাস।

অনেক বছর পরের কথা—

ফ্রান্সের ভূতপূর্ব সম্রাজ্ঞীর সামনে দাঁড়ালেন কালভে। সে নারীর এখন কিছু নেই—রাজ্য নেই, স্বামী নেই, পুত্র নেই। আছে শুধু স্মৃতি—নিয়তির কালো কাপড়-জড়ানো একদা-গৌরবের মূর্তি। স্মৃতির প্রহরী আমি—।

সাম্রাজ্যহারা সম্রাজ্ঞীর জন্য অঞ্জলিতে উপহার নিয়ে কালভে নতজানু।

কী সে উপহার?—এক মুঠো মাটি।

রাজমাতাকে কালভে বললেন: "আমি গিয়েছিলাম তুইলারি প্রাসাদে। সেখানকার দ্রাক্ষাকুঞ্জের তলা থেকে এই ধূলি তুলে এনেছি। ওখানে আমাকে বলল, প্রিন্স ইম্পিরিয়াল শৈশবে এই মাটিতে খেলা করতেন, এতে আঁকা আছে তাঁর পদচিহ্ন। সে মাটি আপনার কাছে বরণীয় হবে মনে করে এক মুষ্টি তুলে এনেছি—এই।"

ধূলিমুষ্টি হাতে নিয়েই শিউরে উঠলেন রাজমাতা। একটা তীব্র যন্ত্রণা যেন পায়ের ডগা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। বিবর্ণ রক্তশূন্য মুখ। প্রিয় পুত্রের স্মৃতিভরা ধূলিমুষ্টি হাতে নিয়ে দ্রুত চলে গেলেন অন্যের দৃষ্টির বাইরে।

মা কাঁদবেন একান্তে।

মাতা, কিন্তু রাজমাতা। প্রকাশ্যে কাঁদবেন কি করে?

সঙ্গীতজীবনের আদি পর্বে, নেপলসে থাকাকালে কালভেকে তাঁর এক বন্ধু বলেছিলেন, "তুমি যদি খাঁটি ইতালীয় কণ্ঠস্বর শুনতে চাও তাহলে আমার সঙ্গে ফনডো থিয়েটারে চলো—সেখানে একজন ভালো

টেনর গাইছেন।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্ধুর তাগিদে কালভে রাজি হন।

গান শুরু হওয়া মাত্র চমকে কেঁপে ওঠেন :

"কী অপূর্ব, কী অসাধারণ কণ্ঠস্বর। এত সুন্দর কিছু আমি কখনো শুনেছি কি-না সন্দেহ। এ যে মিরাকল্।"

সগর্বে বন্ধু বলেন, "হুম্। এমন গলা এখানে অঢেল—সমুদ্রের ধারে নুড়ির মতো—গুণে শেষ করতে পারবে না।"

"না না না – এ ছড়ানো নুড়ি নয়—এ একেবারে এক-নম্বর হীরে"—কালভে চেঁচিয়ে ওঠেন—"কে উনি ?"

"কারুসো।"

এনরিকো কারুসো। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে, "বিশ শতাব্দের সর্বাধিক বন্দিত ইতালীয় টেনর।"

কারুসোর কণ্ঠস্বরের কথা বলতে গিয়ে কালভে উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়েছেন, "আ-হা ! সেই দৈবী, অনন্য, বন্দিত কণ্ঠস্বর। প্রকৃতির বিশাল শক্তি—অপরূপ শিল্পে নিয়ন্ত্রিত। সুগভীর, আন্দোলিত, উৎফুল্ল—যেন সূর্যকিরণ—বিকিরণ করে সপ্তবর্ণ।"

"কারুসোর হৃদয় তাঁর প্রতিভার মতোই বিরাট।" তার পরিচয় একটি ঘটনায় কালভে খুলে ধরেছেন।

লণ্ডনের শহরতলী উইম্বলডনে এক অভিজাত মহিলার বাড়িতে কনসার্টে গাইবার জন্য কালভে ও কারুসো যাচ্ছেন। কারুসোকে খুবই উদ্বিগ্ন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।

কালভে : "কি ব্যাপার, এত নিস্তেজ বিষণ্ণ কেন ?"

কারুসো : "আমি বড় অসুখী কালভে। তোমার মটো—'গান যে করে সে মোহিত করে রাখে নিজের দুঃখকে'—একেবারে মিথ্যে। আমি তো সব সময়েই গান গাই। কই আমার দুঃখ তো যায় না, বরং বেড়ে যায়।"

"কিন্তু হে বন্ধু! তুমি তো মোহিত করো দুঃখী মানুষকে! সেকথা ভেবে তোমার সান্ত্বনা পাওয়া উচিত।"

নির্ধারিত স্থানে সময়ের আগেই এঁরা পৌঁছে গেলেন। গৃহকর্ত্রীর বালকপুত্র অসুস্থ, এঁরা জানতেন। সে পঙ্গু, থাকে বিরাট উদ্যানের এক-প্রান্তে, বিশেষভাবে নির্মিত ঘরে। গৃহস্বামিনী বললেন, "সে আপনাদের অভিনন্দন জানিয়েছে। আর দুঃখ করেছে—গান শুনতে পাবে না বলে।"

বেদনায় ভারী হয়ে এল মহিলার কণ্ঠস্বর : "এ পৃথিবীতে ও যদি কিছু ভালোবাসে, তা গান। এমন পঙ্গু হয়ে রইল যে, জীবনের প্রধান আনন্দ থেকে বাছা বঞ্চিত।"

মহিলার চোখ জলে ভরে গেল।

কারুসো কালভের দিকে তাকালেন। কালভে তাঁর মনের ভাব বুঝে বললেন, "এখনো তো অতিথিরা আসেন নি। তার আগে ছেলেটিকে একটু গান শুনিয়ে আসা যাক না।"

মহিলার আনন্দের সীমা রইল না। এই দুজনকে পুত্রের কাছে পৌঁছে দিয়ে তিনি ফিরে গেলেন অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

যেতে-যেতে কারুসো কুণ্ঠিতভাবে কালভেকে বলেন, "কিছু মনে করো না, আমি জানি তুমি খুব ক্লান্ত। বেশি নয়, দু'একটা গান গেয়েই চলে আসব। আহা বেচারা, গান ভালবাসে, অথচ নড়বার সামর্থ্য নেই।"

কারুসো ও কালভে দুজনই নিতান্ত ক্লান্ত। কারুসো সবচেয়ে জন-প্রিয় টেনর, অবিরাম গাইতে হচ্ছে। কালভে দীর্ঘ ভ্রমণ শেষ করে সদ্য ফিরেছেন লণ্ডনে।

"এই তো শিল্পীর জীবন"—কালভে ভাবলেন। "আমাদের জন্য মধ্য-পথে কোনো সরাইখানা নেই। নির্দিষ্ট ক্ষণে নিজেদের উজাড় করে দিতে হয়—যে-কোনো মূল্যে। ভালো থাকি বা মন্দ থাকি, সুখে থাকি বা দুঃখে থাকি, আশায় বা নৈরাশ্যে—আনন্দ বিতরণের জন্য প্রস্তুত

থাকতেই হয়। ব্যক্তিগত দুঃখে যখন বুক ফেটে যাচ্ছে তখনো সুখী করতে হয় শ্রোতাদের—তাদের উপরে বিছিয়ে দিতে হয় মধুস্বপ্নের জাল—এমন আনন্দের শিহরণ আনতে হয় যার দ্বারা তারা ভুলে যেতে পারে ধূলি-পৃথিবীর জ্বালাকে, যেন বাস করতে পারে ক্ষণেকের জন্যও নন্দনলোকে।”

ছেলেটির বাসস্থানে পৌঁছে এঁরা দেখলেন—যন্ত্রণার শরশয্যায় শুয়ে আছে সে।

সে দৃশ্য দেখেই কারুসো জীর্ণবস্ত্রের মতো নিজের ক্লান্তি ও দুঃখকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন—আর্ত বালকটির উপরে জীবনের তাপ বর্ষণ করতে লাগলেন গানে গানে। একের পর এক গান গেয়ে গেলেন—যা কিছু মনে এল—অবিরাম অনর্গল।

একটি গান শেষ হয় আর রুগ্ন ছেলেটি যেন বিহ্বল উল্লাসে বলে, “এনকোর! এনকোর! আবার আবার।”

তখন কালভে বীণা তুলে নিলেন কণ্ঠে। যত উন্মাদনা উল্লাস আনন্দ মধুরতার ফরাসি ও স্পেনীয় গান তাঁর মনে এল, গেয়ে গেলেন পরপর।

আবেগে ছেলেটির গলা ভেঙে গেছে। ধরা গলায় কেবলই বলছে—“এনকোর! এনকোর!”

কালভে তখন শুরু করলেন কার্মেন-নৃত্য। কত ক্লান্ত তিনি বুঝতে পেরে কারুসো সাহায্যে এগিয়ে এলেন। কালভের শিখানৃত্যের সঙ্গে তুলতে লাগল কারুসোর স্বর্ণকণ্ঠ। আর কারুসো পা ঠুকে, চঞ্চল আঙুলের তুড়ি দিয়ে, কখনো ক্যাস্টানেটস্-এর (করতাল বিশেষ) বাদ্য তুলতে লাগলেন, কিংবা বাজিয়ে চললেন মুখে কাল্পনিক গিটার। তিনি একাই একশো হয়ে বিনা যন্ত্রে গোটা অর্কেস্ট্রা সৃষ্টি করলেন।

পঙ্গু ছেলেটি আনন্দে আত্মহারা। নিজের শারীরিক কষ্ট ভুলে গিয়ে “বাহবা বাহবা, আরও, আরও” শব্দে তাগিদ দিতে লাগল।

গৃহস্বামিনী ছুটে এলেন উত্তেজিতভাবে।

"আপনারা করছেন কি? অতিথিরা সবাই এসে গেছেন। ড্রইংরুম ভর্তি। তাঁরা এক ঘণ্টার উপর বসে আছেন। একেবারে অধৈর্য হয়ে পড়েছেন—"

"ফুঃ!"—কারুসো উপেক্ষার হাসি হাসলেন—"একটু অপেক্ষা করলে ওঁদের কোনো ক্ষতি হবে না। চেয়ে দেখুন আপনার পুত্রের মুখের দিকে। আঃ কী সুখী ও! ওঁদের সব কয়জনের কাছে গান গাওয়ার যে-মূল্য, তার থেকে এই একজনের কাছে গাওয়ার মূল্য কি বেশি নয়?"

যুদ্ধ!

মা কাঁদিছে পিছে, প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।

কালভে প্রথম মহাযুদ্ধের বহু রক্তঝরা দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী। দেশ-প্রেমিকা নারী হিসাবে তিনি যুদ্ধকালে নার্সের কাজ করেছেন, শিবিরে শিবিরে গান গেয়ে বেড়িয়েছেন।

দেশপ্রেমের অভিমান কালভে করতে পারেন। তাঁর ধমনীতে আছে রুথেনিয়ান উপজাতির অদম্য রক্ত, তাঁর কণ্ঠে মৃতকে প্রাণ দেবার সঞ্জীবনী শক্তি। নিউইয়র্কে এক রাত্রে 'লা মার্সাই' গেয়ে এক লক্ষ ডলার জোগাড় করে পাঠিয়ে দিয়েছেন পীড়িত ফরাসি সৈন্যদের সেবার জন্য।

সে রাত্রে দশ হাজার লোকের সামনে তিনি গেয়েছিলেন। এত বড় সমাবেশে কালভে আগে গান করেন নি, যেন ভয় পেয়েছিলেন। তার-পর যেই ধরেছেন সুর, অমনি কোরাস-গায়কদের সঙ্গে সমগ্র জনতা কল্লোলিত হয়েছে এক সুরে, প্রচণ্ড ঢেউয়ের মতো সমষ্টি-কণ্ঠ আছড়ে পড়েছিল, আর কালভে সাইক্লোনে মথিত জাহাজের মতো আথাল-

পাথাল করেছিলেন। তারপর বিখ্যাত ট্রাজেডিয়ান মাদাম র‍্যাচেলের মতো করে নতজানু হয়ে শেষের স্তবকগুলি গেয়েছিলেন, কণ্ঠস্বর বারবার ভেঙে পড়েছিল অশ্রুভারে, দেশপ্রেমের অনন্য প্রেরণায় আলোকিত জগতে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, ভাবোন্মত্ত শ্রোতারা তাঁকে কাঁধে করে ঘুরেছিল সমগ্র প্রেক্ষাগারে, সৈনিকের হেলমেট উল্টে তিনি দান সংগ্রহ করেছিলেন—

হ্যাঁ, কালভে দেশপ্রেমিকা—এ দাবি করতে পারেন।

যুদ্ধকালে কালভে একটি হাসপাতালে গান গাইতে গেছেন। এই হাসপাতালটিতে ফরাসিদের সঙ্গে জার্মান যুদ্ধবন্দীদেরও রাখা হয়েছে। দুই ওয়ার্ডের মধ্যে দরজার ব্যবধান, তা বন্ধ রাখা হয়।

কালভে গান গাইলেন। আহতদের অসহ্য যন্ত্রণার উপর দিয়ে সেই গান প্রাণপ্রবাহের মতো বয়ে গেল।

মোহিত একটি ফরাসি তরুণ কালভেকে বলল, "তুমি অনুমতি দিলে মাঝের দরজাটি খুলে দেওয়া যায়।"

কালভে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকেন।

"ওধারে যে হতভাগ্যরা আছে, তারা কেন তোমার স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর শোনার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে?"

শুনেই ঘৃণায় রাগে ঝলসে ওঠেন কালভে। দেশপ্রেমিক ফরাসিনী তিনি, শত্রু জার্মানদের গান শোনাবেন?

"না, কদাপি না। আমি কখনো ওদের কাছে গান গাইতে পারব না। ওরা আমাকে নির্মম আঘাত করেছে।"

"আমার থেকেও"—তরুণ সৈনিকটি তার স্বচ্ছ দুই চোখ মেলে ধরে, "আমার থেকেও তোমাকে বেশি আঘাত করেছে?"

কালভে এবার ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন ছেলেটিকে—তার ডান হাতখানি নেই।

যুদ্ধ একদিন শেষ হয়। যারা যুদ্ধে যায়, তাদের অনেকে মরে, বেঁচে থাকে আরও বেশি। যারা বেঁচে থাকে, তাদের অনেকে কিন্তু পুরো মানুষ হয়ে বাঁচতে পারে না—কতজন বিকলাঙ্গ হয়ে অবশিষ্ট দিনগুলিতে যুদ্ধের ক্রূর স্মৃতিকে বহন করে, কে তার খোঁজ রাখে!

এর মধ্যে অন্ধত্বই বড় অভিশাপ। কারাগারের বাইরে বৃহত্তর কারাগারে তাদের চিরবন্দিত্ব।

সরকার ও জনসাধারণের পক্ষে এদের আর্থিক কষ্ট দূর করার এবং আমোদ-আহ্লাদ দেবার জন্য কিছু-কিছু চেষ্টা অবশ্য করা হয়।

অন্ধদের একটি হাসপাতালে কালভে গান করতে গেছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে আসছেন—বিস্তৃত অঙ্গনের দিকে তাকালেন যেখানে অন্ধরা দল বেঁধে বসে আছে আর খেলার চেষ্টা করছে। কালভে দেখলেন, ছেলেগুলির শরীরে অদ্ভুত স্বাস্থ্য ও শক্তির ঐশ্বর্য, অথচ খেলার জিনিসগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে কাঁপা করুণ হাতে। যৌবনের মধ্যাহ্নদিনে এদের উপর নেমেছে কালো পর্দা। স্বাভাবিক সুস্থ গৃহজীবন থেকে এরা বঞ্চিত—পাবে না প্রেমময়ী পত্নী, আনন্দময় সন্তান। কেন এদের বিয়ে হবে না? এদের ভালোবেসে বিয়ে করবে, এমন মেয়ে কি কেউ নেই?

হঠাৎ কালভের মনে পড়ে যায়, তাঁর এক বান্ধবীর সঙ্গে কথাবার্তার কথা। বান্ধবী এক অনাথালয়ের কর্ত্রী—পরিত্যক্ত শিশুকন্যা এবং পথে-পথে ঘুরে বেড়ানো বালিকাদের সেখানে আশ্রয় দেওয়া হয়। বিয়ের বয়স হলে তাদের বিয়ের চেষ্টা করাও হয়। বিয়ে হয়ও মাঝে মাঝে।

কালভের বান্ধবী বলেছিলেন: "দুঃখের কথা হল, যেসব মেয়ে কুৎসিত, তারা স্বামী পায় না, তাদের অন্য গুণ যতই থাক। তারা কত অসুখী কি বলব!"

বান্ধবীর কথাগুলি মনে পড়া মাত্র কালভে হাসপাতালের কর্তার সঙ্গে

আলোচনা করলেন। তারপরে ছুটলেন অনাথালয়ে বান্ধবীর কাছে। বান্ধবীকে নিজের পরিকল্পনার কথা বলতেই তিনি উৎসাহী হয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়েগুলিকে ডেকে পাঠালেন। একদল লাজুক মেয়ে এল, তাদের পোশাক একরকম, কিন্তু সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিতে তারা কত পৃথক।

তাদের কাছে কালভে নিজের হৃদয় খুলে ধরলেন। শেষে বললেন :

"কন্যাগণ! তোমরা কল্পনায় দেখে নাও—গৌরবময় মধ্যদিনের আলোকে পূর্ণ বিরাট প্রাঙ্গণে বসে আছে দলে-দলে অপূর্ব যুবকেরা—তাদের চোখে কিন্তু মধ্যাহ্নের কোনো আলোকরেখা প্রবেশ করতে পারছে না। হতভাগ্যদের সব আছে তবু কিছু নেই। এই জনাকীর্ণ পৃথিবীতে ওরা নিঃসঙ্গ। ওদের হাত ধরবে কে বলো!

"অথচ ওরাই হবে সেরা স্বামী। ওদের শারীরিক ক্ষতির জন্য তা হবে। ওদের কাছে সঙ্গিনীদের বয়স কখনো বাড়বে না। সময় গেলে তোমাদের যৌবন শেষ হয়ে যাবে, রূপ যদি থাকে ঝরে যাবে, ক্রমে কুৎসিত জরাতুর বৃদ্ধা হয়ে উঠবে—কিন্তু ওদের কৃতজ্ঞ কল্পনায় তোমরা, যারা ওদের বিয়ে করবে, চিরদিনই যৌবনের অম্লান দীপ্তিতে জ্যোতির্ময়ী থাকবে। বলো—তোমরা এগিয়ে আসবে না—ওদের ডেকে নেবে না?"

কালভের কণ্ঠস্বর আবেগে থরথর করে কাঁপে। এক মহান প্রার্থনা-সঙ্গীতের মতো তা উৎসারিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে না।

না, আসছে একজন, একটি মেয়ে, নিতান্ত সাদাসিধে চেহারা, খারাপ বলাই ঠিক, কিন্তু দু' চোখে বুদ্ধির আলো—সে এগিয়ে এসে বলল—"আমি রাজি।"

কালভে তাকে নিয়ে তখনি বেরিয়ে পড়লেন।

অনাথালয়ের গেটের কাছে এসে মেয়েটি থমকে দাঁড়াল।

"মাদাম, একটি অনুরোধ। সঙ্গী বেছে নেবার স্বাধীনতা আমাকে

দিতে হবে। সে আমাকে দেখতে না পাক—আমি তো সারাজীবন তাকে দেখব।"

মেয়েটিকে নিয়ে কালভে যখন হাসপাতালে পৌঁছলেন, অন্ধ লোকগুলি তখনো চত্বরে বসে আছে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই উত্তেজিত মেয়েটি কালভের হাত টেনে বলে, "ঐ যে—ওকে চাই।"

দেবতার মতো রূপ ছেলেটির, দীর্ঘ সুঠাম শরীর, সোনালী চুল—সকলের মধ্যে সেরা—তাকেই বেছেছে মেয়েটি।

কালভে এগিয়ে গিয়ে যুবকের হাতের উপরে তুলে দিল মেয়েটির হাত:

"এই তরুণী মেয়েটি এসেছে তোমারই জন্য। এ তোমাকে নিয়ে একটু ঘুরে আসবে। ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন তোমাদের।"

এক ঘণ্টা পরে তারা ফিরল। বোঝাপড়ায় আসতে দেরি হয় নি।

"অপূর্ব উনি"—মেয়েটি লাজুকভাবে বলে।

অন্ধ যুবকটির মুখে বিস্ময় ও আনন্দের হঠাৎ-পাওয়া আলো। সে কালভের হাত চেপে ধরে আবেগে:

"ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাদাম। অপরূপা ও। কী চমৎকার কথা বলে। আর কী সুন্দর চেহারা।"

এক বছর পরে কালভে উক্ত দম্পতিকে দেখতে গেলেন। তারা ঘর বেঁধেছে। একটি ছোট খামার আছে তাদের, একটি সুন্দর কুটীর। পরিচ্ছন্ন জায়গাটিকে ঘিরে আছে সুখ আর শান্তি।

এক ধারে বেঞ্চে বসে আছে অন্ধ যুবকটি দেওয়ালে পিঠ দিয়ে। তার কোলে একটি নগ্ন শিশু, কী ফুটফুটে। স্ফূর্তিতে হাত-পা ছুঁড়ছে। অন্ধ পিতার সমস্ত শরীর থেকে যেন স্নেহ ঝরে পড়ছে। শিশুটির নরম

চুলের মধ্যে নিবিড় সুখে তার আলতো আঙুলগুলি নড়ে বেড়াচ্ছে, মুখে দিব্য আলোক, সমস্ত স্থানটি তাতেই ভরে আছে।

কাছে বসে শিশুর মা দোলনা বাঁধছে।

কালভেকে দেখেই সে ছুটে এল। কি আনন্দ! স্বয়ং মাদাম এসেছেন! কি করে যে অভ্যর্থনা জানাবে, ঠিক করতে পারছিল না।

খানিক পরে একান্তে দুজনের কথাবার্তা হতে লাগল—তৃপ্তির, খুশির কত কথা।

তবু কালভের মনে হল, কোথায় যেন একটা ছায়া রয়েছে। কি যেন মেয়েটিকে কষ্ট দিচ্ছে। মেয়েটি পুরো সুখী নয়। কেন, কালভে তখনি জিজ্ঞাসা করলেন না। জানেন, মেয়েটি নিজেই তা বলবে।

শেষকালে মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়ল।—"মাদাম, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।"

কালভে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন।

"মাদাম, আমি মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক।"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মেয়েটি বলতে থাকে, "কী লজ্জা! ওকে আমি বলেছি আমি সুন্দরী, আমার চুল সোনালী, আমার চোখ নীল। অথচ আমি ডাইনির মতো বীভৎস, বিকট। এখন যদি সত্যকথা বলি, ওর ভালোবাসা থাকবে না। কি হবে তাহলে?"

মেয়েটি হাহাকার করে বলে, "অথচ ও আমার প্রাণ, জীবন, আমার দেবতা। কি করে ওকে প্রবঞ্চনা করে চলি বলুন—বলুন আমাকে—"

কালভে মেয়েটিকে কাছে টেনে নিলেন। কোমল হাত রাখলেন তার মাথায়।

"ভয় করো না। সত্য বলো। আর বলার সময়ে ওর কোলে তুলে দিও তোমার সন্তানকে।"



নিজের মুখোমুখি

কে আমি?

সঙ্গীতজগৎ থেকে বিদায় নিয়ে কালভে ফিরে গেছেন নিজের দুর্গ-প্রাসাদ ক্যাব্রিয়ার-এ।

রাত্রি হয়েছে। শয়নের পূর্বে প্রার্থনায় নতজানু।

হে প্রভু, করুণা করো। এ জীবন তোমার। এ কণ্ঠস্বর তোমার। উৎসর্গ করি তোমাকে।

কালভের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

কালভে ভাবেন—কি তুচ্ছ আর অগভীর ঐসব মানুষগুলি যারা আমাদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে ব্যঙ্গ করে, আর বলে, আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। না, আমরা তা নই—আমরা ধর্ম-বিশ্বাসী।

ছাত্রীদের একজন একদিন কালভেকে বলেছিল, "আপনি সঙ্গীতের বিজ্ঞান ও শিল্পের অনেক কথাই বললেন। কিন্তু সেরা গায়িকা হতে হলে সর্বোপরি কী চাই?"

"ঈশ্বর-বিশ্বাস"—কালভের সুনিশ্চিত উত্তর।

"আমার দৃঢ় ধারণা, ধর্ম মানুষের জীবনে মূলগত ব্যাপার। অসীম

তার গুরুত্ব। সাধারণ কণ্ঠস্বরকে যে-আগ্নেয় শক্তি অতীন্দ্রিয় সুরতরঙ্গ করে তোলে—তা আসে উর্ধ্বলোক থেকেই। সেই শক্তির আশীর্বাদ প্রার্থনা করো, যদি সাধারণ গায়কের নৈপুণ্যের উপরে উঠতে চাও।"

কনভেণ্টের দিনগুলির কথা কালভের মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের কথা, ঈশ্বরপুত্রের দিব্যজ্যোতিতে যিনি দেখা দিয়েছিলেন।

আমি ঈশ্বরের সেবিকা। ধন্য আমি। কালভে ভাবেন।

প্রভাত হয়। কালভে বিছানা থেকে দ্রুত নামেন। যা হোক একটা পোশাক টেনে গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়েন। এখনি খামারে যেতে না পারলে সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে। কত কাজ সেখানে। দশটা পর্যন্ত বাগানে ও খামারে কাটল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে আবার গেলেন। পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে ছড়িয়ে আছে ক্ষেত ও বাগান। কী সুন্দর। ফুলে ফলে সব্জীতে ভর্তি। বাল্যে পিসিমার বাগানের যে সব ফুল ভালোবাসতেন, তাদের এনে লাগিয়েছেন। রূপে গন্ধে আর স্মৃতিতে ভরপুর মন। তারপরেই চোখ যায় সব্জী-বাগানের দিকে। কাকে নিয়ে বেশি গর্ব করবেন—সুন্দর ফুল না সতেজ সব্জী? ওরা সবাই প্রকৃতির দান। ওরা একত্রে দেহ-মনের তৃপ্তি ও পুষ্টি আনে। কালভে ভাবতে থাকেন।

অপরাহ্ণ শেষ। সূর্যাস্তকাল। গগনে ভুবনে রঙের মাতামাতি। নানা ছায়া নিয়ে বিছিয়ে আছে শান্ত উপত্যকা। রাখাল বালকেরা ফিরছে দূর চারণভূমি থেকে, সঙ্গে মেষপাল। পশুগুলির গলায় ঝোলানো ঘণ্টার মধুর শব্দ, পদশব্দ, ঘরের ফেরার ডাক, নীড়সন্ধানী পাখির পাখার ঝাপট, দিনান্ত কাকলি, ক্রমে নিকটে-আসা রাখালদের সন্ধ্যা-সঙ্গীত।

সুরে সুর তুলে নেন কালভে। তাঁর কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে বহু বর্ণাঙ্কিত আকাশে, রঙিন পাখির মতো।

কালভে ভাবেন : এই তো আমি, খাঁটি আমি, মাটির মেয়ে। এই উদার আকাশ, সহজ জীবন, মূল প্রাণের স্পর্শ, এই প্রত্যাবর্তন আদিতে অকৃত্রিমে—এই তো আমি।

কালভে ফিরে আসেন প্রাসাদে। ভিতরে আলো জ্বলেছে এতক্ষণে। সুন্দর সজ্জিত করিডর দিয়ে হেঁটে গিয়ে একটি ঘরে পৌঁছলেন বিশ্রামের জন্য। চোখ পড়ে গেল ঘরের প্রান্তে।

ওখানে ওরা কারা? সাজসজ্জা করে বসে আছে?

না, ওরা মানুষ নয়—পুতুল। কালভে পুতুল ভালোবাসেন। বহু যত্নে পুতুল তৈরি করেছেন নিজের বিভিন্ন ভূমিকার আকারে—কার্মেন, মার্গারিট, জুলিয়েট, ওফেলিয়া, লা নাভার‍্যাইজ, সাফো, সান্টুৎসা –। কী জীবন্ত ওরা!

হঠাৎ কালভে হেসে ওঠেন।

মাঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে মাটির মেয়ে ভাবছিলুম। ঐ যে রাখালের সুর গলায় তুলে নিয়েছিলুম—ওকি রাখালের গলা? রাখালেরা বুঝবে ঐ গান? ও গান পাগল করেছিল কাদের? তারা কি গ্রামের মানুষ?

দপ্ দপ্ করে পাদপ্রদীপের আলো জ্বলে উঠল। কালভে দেখছেন। দৃশ্যপট বদলে গেছে। বিরাট শহরে জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগার। পৃথিবীর মহান নগরীসমূহ—প্রচণ্ড প্রতিযোগিতায় বিস্ফারিত—স্থূল কার্যের মতোই সেখানে শিল্প সঙ্গীত সংস্কৃতির গরিমা। থিয়েটার, মঞ্চের ধূলি, গ্রিজ-পেণ্টের গন্ধ, তীব্রোজ্জ্বল গ্যাসের চোখ-ধাঁধানো আলোক, অজস্র জিনিস-ছড়ানো ড্রেসিংরুম, ফুলের ঘন শ্রেবিভি, অর্কেস্ট্রা, উন্মুখ দর্শক, উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন—

"কে ঐ অপরিচিত নারী—চিত্রিত মঞ্চে নানা ভঙ্গিতে চলছে ফিরছে, নিজেকে ব্যক্ত করছে!" কালভে বিস্ময়ে ভাবেন, 'ও কে? ঐ সব বিচিত্র পোশাকে—কখনো জিপসি-মেয়ে, কখনো সম্রাজ্ঞী, কখনো ক্রীতদাসী? ওরা কি আমি—আমি নয়?"

ওরা নড়ছে, ডাকছে—সাড়া দেব না?

"আমি কি আমার শিল্পকে, শিল্পীজীবনকে, ভালোবাসি না? কে বলে! তাকে আমি পূজা করি। তা চিরবন্দিত আমার কাছে। কি বলছ?—আমাকে যদি জীবনসূচনায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, অপেরা-জীবনকে আবার বরণ করব কি-না? নিশ্চয় নিশ্চয় করব। মহান ঐ আহ্বান—সাড়া দেব না, তা কি হয়? যখন সাফল্য ঘটে তখন আমি যে কোন আনন্দতরঙ্গে ডুবে যাই, তা কি করে বোঝাব তোমাদের? সাফল্য—সার্থকতা—বিজয়! কী প্রচণ্ড তার অনুভূতি— ভাষাতীত।"

অবসরের জীবনেও চ্যালেঞ্জ এলে কিভাবে ভিতরের ঝিমানো সাপ ফণা ধরে ওঠে, তার ঘটনা কালভের মনে পড়ে যায়।

একদিন এক বান্ধবী এসে কালভেকে বললেন, "এই সব অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের তোমার কাছে এনেছি। আমাদের কালে আমরা যেভাবে তোমাকে পেয়েছি—তার কিছু স্বাদ এদের দিতে পারবে?"

ছেলেমেয়েগুলির বয়স কুড়িও নয়। তাজা তরুণ মুখ, চকচকে চোখ, জিজ্ঞাসায়, কৌতূহলে কাঁপছে। হঠাৎ কালভের মনে হল, হায়, বয়স হয়েছে আমার—আমি এদের থেকে কত দূরে! এরা আমার নাম ছাড়া আর কিছু জানে না। আমার কণ্ঠস্বরের দ্বারা এদের মধ্যে কোনো স্মৃতি সাধ সুখ বেদনা জাগাই না। এদের কাছে আমি অপরিচিত নির্বাপিত বিবর্ণ একটি গ্রহ মাত্র।

আমি পারি—এখনো পারি। কালভে ছটফটিয়ে ওঠেন। ওদের কৌতূহলকে নিবৃত্ত করব—ওদের পিতামাতারা বৃথাই আমার বন্দনা করেনি—দেখিয়ে দেব।

কালভে গান ধরলেন—কণ্ঠে ধরলেন প্রাণ। ওদের মোহিত হর্ষ আমার চাই-ই। ওদের জন্য নয়—আমার জন্য। না, নির্বাপিত আগ্নেয়-গিরি নই আমি—নই চলন্ত মমি।

কালভে গাইলেন—যেমন করে গাইতেন এই ছেলেমেয়েগুলির পিতামাতার কাছে।

ওরা আনন্দে উছলে উঠল।

"আর কখনো এত মধুর ঠেকেনি হর্ষধ্বনি, এত উত্তপ্ত ঠেকেনি সমাদর-বাক্য—যা এই তরুণ বন্ধুদের কাছ থেকে পেলাম। যেন ফিরে এল পুরনো দিনগুলি, যখন আমি কুড়ি বছরের তরুণী, প্রথম জয় করেছি আমার সামনের অচেনা দর্শকদের। সেই একই শিহরণ, একই উল্লাস—আজও। আমি প্রমাণ করেছি, আমি এখনো সেই একই কালভে।"

"জানি আমি···গৌরব অর্জন করা কঠিন। আবার এলেও তা স্বভাবে পলাতক। বিশেষত অভিনয় ও গানের জীবন যাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এটা নির্মম সত্য। আমাদের সৃষ্টি বাতাসে মিশে যায় কোনো চিহ্ন না রেখে। এই কণ্ঠ থেকে যা বেরিয়ে আসে, তা ফিরে যায় না সেখানে। অন্য শিল্পীদের তুলনায় আমাদের জয় হঠাৎ ঘটে, কিন্তু হঠাৎ আলোর ঝলকানি তা, তুলনাগতভাবে অবস্তুক, অচিরস্থায়ী। অতীতের কণ্ঠস্বর কার মনে আছে? শুধু স্মৃতি থাকে, রীতি থাকে, শুধু থাকে নাম।"

তবু ঐ আমার জীবন। মরণের আগে সূর্য চন্দ্র তারকাকে অঙ্কে ধরেছি তো—জল-বুদ্‌বুদ্‌ গর্বে বলে।

বুদ্‌বুদ্‌ ফেটে যায়। এখন শুধু ছল্‌ছল্‌ জল—জলের কান্না।

শূন্য ঘর ভরে যায় দীর্ঘশ্বাসে। কী নেই আমার! শুধু সে নেই।

কোথায় গেল মেয়েটি আমার। পুড়ে মরল।

সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কালভেকে ঘিরে বসেছে। এই মহান শিল্পীর কাছে তারা ধ্রুববাণী শুনতে চায়। কালভে বললেন :

"তোমরা নবীনা। তোমরা অপেরায় প্রবেশ করতে উৎসুক। মনে রেখো, পাদপ্রদীপের চোখ-ধাঁধানো আলোর জীবনের দারুণ আকর্ষণ আছে সত্য, কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি গৌরবময় ভাগ্য সম্ভবপর —দুই তিনজনের একটি ছোট্ট সভাকক্ষের পরিচর্যায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা—যারা তোমাকে সেই চিরমধুর নামে ডাকবে—মা!"

এতক্ষণে শেষ কথা বলা হয়েছে। কালভে তৃপ্তি বোধ করেন।

হয়েছে কি? শেষ কথা কি কেউ নিজের সম্বন্ধে বলতে পারে—পেরেছে?

নচেৎ কালভে কেন আতুর চোখে তাকিয়ে থাকেন সাজানো পুতুল-গুলির দিকে? কেন তার মধ্যে তুলে নেন একটি বিশেষ পুতুল—পাগলিনী ওফেলিয়ার পুতুলটিকে?

ওফেলিয়ার পুতুল হাতে নিয়ে কাঁপতে থাকেন। প্রেম—প্রেমের অভিশাপ—উন্মত্ততা—মৃত্যু—।

একের পর এক স্মৃতি আসছে আর ছিন্ন কণ্ঠ থেকে কাতরোক্তি উঠছে। কী জ্বালা এই দহনজ্বালা, গরলজ্বালা।

সরলা ওফেলিয়া, কোমলা মধুরা, ভালোবেসেছিল হ্যামলেটকে। দর্শন ও কল্পনার জগতের মানুষ হ্যামলেট—নিক্ষিপ্ত হল সেই বিষাক্ত পরিবেশে যেখানে ব্যভিচারিণী জননী স্বামী-হত্যার পরেই কণ্ঠলগ্ন হয় দেবরের। প্রতিহিংসা নেবার কর্তব্যে তাড়িত, অনিশ্চিত বিবেকের দংশনে উদ্‌ভ্রান্ত হ্যামলেট, হাত বাড়িয়েও যখন ধরবার হাত পায়নি, তখন স্বয়ংকৃত ও যথার্থ উন্মত্ততায় অধীর হয়ে আঘাত করেছিল অপরকে এবং নিজেকে। তার আঘাতের লক্ষ্যের মধ্যে ছিল ওফেলিয়া। সে

পাগল হয়ে গিয়েছিল। তার পাগল কান্নার গান :

And will he not come again ?
And will he not come again ?
No, he is dead···
He never will come again.

'সেকি আসবে না, সে কি আসবে না ? মৃত—সে তো আসবে না, কভু আসবে না।

পাগলিনী ওফেলিয়া নিজেকে সাজিয়েছিল পত্রপুষ্পে। তার পরে নদীতে টলে পড়েছিল। জলপরীদের মতো ভেসেছিল খানিকক্ষণ। গান গেয়েছিল সেই অবসরে। তারপরে ডুবেছিল—অনন্ত শান্তিতে, মৃত্যুর শীতলতায়।

আমি ওফেলিয়া—হাঁ আমি ওফেলিয়া—

সতীদাহের জ্বলন্ত আত্মা বাতাসের ঝাপটে-ঝাপটে বলে যায়—আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি।

নিজ সমাধির উপরে তাঁর কোন্ মূর্তি থাকবে, তা কালভে পূর্বাহ্ণে স্থির করেছিলেন। সে মূর্তি তাঁর ওফেলিয়া-ভূমিকার। বিখ্যাত ফরাসি ভাস্কর হ্যনি পিউশ সে মূর্তি অপূর্ব দক্ষতায় নির্মাণ করেছেন।

পাগলিনী ওফেলিয়া—তাকেই কালভে তাঁর মরণোত্তর স্মারকরূপে পরবর্তী মানুষের কাছে রেখে যেতে চাইলেন।

ব্যর্থ প্রেমই যদি তাঁর মর্মান্তিক জীবনসত্য না হবে, তাহলে কেন ঐ ইচ্ছা তিনি করেছিলেন ?



শেষ — অশেষ ...

ইংরাজিতে প্রকাশিত কালভের আত্মজীবনীর কাহিনী শেষ হয়েছে ১৯২০-এর গোড়ার দিকে। সফলতার সুখের জীবনের মধ্যে তিনি তখন আছেন। তারপরে আরও কুড়ি বছর তিনি বেঁচেছিলেন। সে জীবন বাহ্যত কিন্তু সুখের হয়নি, ক্রমবিলুপ্তির অন্ধকার তাঁকে ধীরে গ্রাস করেছিল। দীর্ঘ আয়ুর রশি—তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছিল—পৃথিবীর প্রধান রাজপথ দিয়ে নয়, বিস্মৃতির পরিত্যক্ত বাঁকা চোরা পথ ধরে। সঞ্চয়েও টান পড়েছিল। অজস্র উপার্জন করেছিলেন, বেহিসেবী খরচও তেমনি। শেষে এমন অবস্থা হল—ক্যাব্রিয়ার-প্রাসাদকে বেচে না দিয়ে উপায় নেই। 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' দুর্গ-ভবনটি—যার প্রতিটি বিন্দুকে চুম্বন করেছে কামনার রক্ত অধর—তাকে ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হল তাঁকে। প্রাসাদ বিক্রির টাকা নিয়ে কালভে যখন তাঁর নতুন বাসস্থানের দিকে এগোলেন তখন হয়ত

অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাবার পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু সংস্থান হাতে আছে, কিন্তু ভিতরে নিঃস্ব হয়ে গেছেন। প্রাসাদটি কেবল তাঁকে আশ্রয় দেয়নি, দিয়েছিল আত্মবোধ—ঐ দুর্গ তিনি জয় করেছিলেন—তাঁর কীর্তিস্তম্ভ ওটি—ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হল!

কী রইল জীবনে! শোক আর শূন্যতা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে সতের জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে হারিয়েছিলেন। বংশের শেষ সলতে একটি ভাইপো এলি কালভে তাকে বড় ভালোবাসতেন, মঞ্চে অবতীর্ণ হবার যোগ্যতা সে অর্জন করেছিল, কে জানে কালভে-বংশের রক্ত হয়ত ওকে অবলম্বন করে আবার শিল্পসৃষ্টির পথে ধাবিত হবে—না, সেও মরে গেল কিছুদিনের মধ্যে, হৃদ্‌রোগে।

নিজের সন্তান—সেও নেই। আঃ—হা—! সেই নিশিদিনের জ্বালা, নিত্য মৃত্যু-সহচরী। মেয়েটি, আমার একমাত্র সন্তান, পুড়ে মরল আমারই অবহেলায়। সেই পাপেই তো আর কোনো সন্তান হল না।

৫২ বছর বয়সে ইতালীয় সহ-গায়ক সিনর গাস্‌পারিকে বিয়ে করেছিলেন—যদি পুনশ্চ সন্তানলাভ করতে পারেন—হয়নি—ব্যর্থ ব্যর্থ সবকিছু।

সন্তান হবে আমার? কন্যাকে মেরেছি আমি। নিজের হাতে মারিনি—কিন্তু তাকে মেরেছিল আমারই অপরিমিত খ্যাতি প্রতিপত্তির লোভ। তাকে একলা পরের ঘরে ফেলে রেখে চলে এসেছিলাম আলোজ্বলা মঞ্চে হাততালি কুড়োতে। ফিরে গিয়ে আর তাকে পেলাম না। কী অভিমান নিয়ে সে চলে গেল!

কালভের চোখের সামনে নিজের অভিনয়ের একটি দৃশ্য ভেসে ওঠে। গুনো-র ফাউস্ট-এর মার্গারিট-ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ। মার্গারিট নিজ শিশুকে হত্যার অপরাধে কারাগারে আবদ্ধ অবস্থায় প্রতীক্ষা করছে শেষ শাস্তির জন্য। সে প্রার্থনা করছে ঈশ্বরের কাছে—ত্রাণ করো, এই পাপ থেকে উদ্ধার করো প্রভু, তুমি মঙ্গলময়! আমি তোমারই, ক্ষমা

করো, করুণাময় !

God the just, to Thee I abandon myself.
God the good, I am Thine, forgive me.

পাপ ? নিজেকে পাপী মনে করলেই পাপ। জাগো জাগো মহাপ্রাণ, অমৃতের সন্তান !

কালভে চমকে শিউরে ওঠেন। স্বামী বিবেকানন্দের জ্যোতির্ময় আকার যেন দেখতে পান। উত্তোলিত হস্তে অভয় বরমুদ্রা।

কালভে অবুঝের মতো মাথা নাড়েন। না, আমার অপরাধের সীমা নেই। জীবনে জমিয়েছি কত ভার। কত অন্যায়। কত অকৃতজ্ঞতা।

কালভে হঠাৎ খাড়া হয়ে স্বামীজীর অপার্থিব আকারের দিকে তাকান। থরথরিয়ে বলেন—স্বামীজী ! তোমার সম্বন্ধেই কি সব কথা বলে যেতে পেরেছি –বলতে কি পেরেছি মুক্তকণ্ঠে সকলের কাছে—যদি আমি একদা মৃত্যু থেকে ফিরে আসি জীবনে—সে তোমারই করুণায় ?

১৯৩০-এর শেষের দিকে মাদাম ত্রিনেত্তি ভার্দিয়ে-র সঙ্গে কালভের কথা হচ্ছিল প্যারিসে কালভের বাসকক্ষে বসে। শীঘ্রই ফরাসিতে কালভের আত্মকাহিনী বেরুবে। এর আগে ইংরাজিতে আত্মকথা বেরিয়ে গেছে। তাতে স্বামীজীর বিষয়ে একটি পুরো অধ্যায়ে অনেক কিছু লিখেছেন। সে বিবরণও কিন্তু কালভের এই অন্তরঙ্গ বান্ধবীর কাছে অপ্রচুর মনে হয়েছে। তিনি আশা করেন, ফরাসি আত্মকথায় কালভে আরও বিস্তারিতভাবে স্বামীজী-প্রসঙ্গে লিখবেন।

মাদাম ভার্দিয়ে বললেন, 'কালভে, আশা করি এই বইয়ে তুমি স্বামীজীর বিষয়ে বড়ো করে একটি অধ্যায় লিখেছ, বিশেষত চিকাগোয় যেভাবে তিনি তোমার জীবনরক্ষা করেছিলেন, এই প্রসঙ্গটি খুলে বর্ণনা

করেছ।'

এতক্ষণ কালভে উৎসাহে আত্মজীবনীর কথা বলছিলেন, এখন হঠাৎ তাঁর আবেগের সুর কেটে গেল, অত্যন্ত অপ্রস্তুত আর লজ্জিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পরে মৃদুস্বরে বললেন :

'তুমি জানো ত্রিনেত্তি, স্বামীজীর সম্বন্ধে আমি যা লিখতে চাই তা লিখতে সমর্থ নই। এখন জীবনশেষে পেঁ ৗছেছি। আমি ক্যাথলিক। সম্প্রতি আমার গ্রাম অ্যাভেইর‍্‌-তে কয়েকবার গিয়ে সেখানকার পাদরীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি। সেখানে গির্জার সমাধিভূমিতে আমার পিতামাতার পাশে ঠাঁই পেতে চাই। শেষজীবনে ঐ আশাটুকু করে বসে আছি। চাষীর বাড়ির মেয়ে আমি। আমরা তো ঐ স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকি—জন্মভূমিতে বাবা-মার পাশে সমাধিস্থ হব।'

কালভে ব্যথাতুর কণ্ঠে বলতে থাকেন :

'স্বামীজী সম্বন্ধে যা লিখতে চাই তা যদি লিখি তাহলে, গাঁয়ের পাদরী বলেই দিয়েছে, ওখানে সমাধিস্থ হবার অধিকার হারাবো। আমাকে ধর্মচ্যুত করা হবে। না না, ত্রিনেত্তি, তা আমি সহ্য করতে পারব না।'

কালভের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

—স্বামীজী! তোমার কাছে অপরাধী আমি—আমার স্বদেশবাসীর জন্য লিখিত আত্মজীবনীতে তোমার সম্বন্ধে সব কথা লিখতে পারিনি। বলতে পারিনি—তুমি আমার কাছে শিশু ভগবান। বলতে পারিনি—তুমি পরিত্রাতা। কেন পারিনি তা তুমি জানো। তুমি তো মনের কথা খোলা বইয়ের পৃষ্ঠার মতো পড়ে নিতে পারো। কিন্তু লিখতে না পারি, সেকথা বলেছি তো জনে-জনে—যখনই সমভাবনার মানুষ পেয়েছি!

দিলীপকুমার রায় ফ্রান্সে গেছেন ১৯২৭ সালে। 'দক্ষিণ ফ্রান্সে সিন্ধুসৈকতা নীস নগরীতে এক কার্বণ্টেসের' বাড়িতে মাদাম কালভের

সঙ্গে দিলীপকুমারের পরিচয় হয়। সেইসময়ে কালভে 'পুণ্যশুভ্র' 'অলোকসামান্য মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ' কিভাবে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, খোলাখুলি বললেন। শেষে বললেন :

"তাঁর কথা ছিল আমার কাছে একমাত্র অমৃত, আর মুগ্ধ হতাম তাঁর মাতৃসম্বোধনে—যদিও তখন আমার বয়স কম।···য়ুরোপে আমেরিকায় তিনি দিয়েছেন কত আর্তকে শান্তি, কত অন্ধকে দৃষ্টি। তাঁর কাছে শুনতাম—দৃষ্টিদাতার নামই গুরু।"

১৯৩২ সালে স্বামী বিজয়ানন্দ প্যারিসে গেছেন, সেখানে মিস ম্যাকলাউড—আঁরি বের্গসঁ এবং মাদাম কালভের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলেন, বের্গসঁর বাসভবনে। দীর্ঘ সময় ধরে স্বামীজীর কথা তাঁরা আলোচনা করলেন। বের্গসঁ তখন নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে চলা-ফেরায় অসমর্থ। বারে বারে দুঃখ করে বললেন, 'স্বামীজী যখন প্যারিসে এসেছিলেন তখন আমি আমার দম্ভের জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাইনি। রোলাঁ তাঁর উপর বই লিখেছেন। তিনি সাহিত্যিক, দর্শন ও অনুভূতি ঠিক তাঁর বিষয় নয়। যদি ভগবান আমাকে একটু সুস্থ রাখেন তাহলে আমি (মাদাম কালভের দিকে দৃষ্টিপাত করে) স্বামীজী যে ভগবানে অধিষ্ঠিত মহাপুরুষ ছিলেন, সেকথা শুনিয়ে দেব।'

এর পরে বের্গসঁর অনুরোধে মাদাম কালভে, তখন তাঁর বয়স ৭৪, তথাপি গেয়েছিলেন 'লা মার্সাই', অপূর্ব কণ্ঠে, যে-গান স্বামীজী অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

দার্শনিক বের্গসঁ রোমা রোলাঁর লেখার অধিমানসের উপযুক্ত সমাদর নেই বলে অতৃপ্তি বোধ করতে পারেন, কিন্তু রোলাঁর লেখায় কালভে অবশ্যই প্রেরণা ও অগ্নিতে পূর্ণ বিবেকানন্দকে পেয়েছিলেন, তাই সে গ্রন্থ পড়ে নিজের আনন্দকে উদ্‌ঘাটিত করে লিখেছিলেন—'বিবেকানন্দ

'আমার কাছে পরিত্রাতা।'

পরিত্রাতা তুমি, রক্ষাকর্তা! ঘটনাগুলি কালভের মনের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করে। তার একটি—

স্বামীজীর দেহত্যাগের কুড়ি বছর পরের ব্যাপার। কালভের ক্যাব্রিয়ার-প্রাসাদে অনেক অতিথি এসেছেন। প্রাসাদটির স্থাপত্য বোঝাবার জন্য অতিথিদের নিয়ে কালভে ঘুরছেন। প্রাসাদের ঝুল-বারান্দাটি চমৎকার, কালভের গর্বের জিনিস। সেটি দেখাবার জন্য ছাতের উপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, প্রায় প্রান্তে পৌঁছেছেন, একটু পরেই পাহাড়ের সোজা খাদ—সহসা কালভে স্বামীজীর চাপা কণ্ঠস্বর শুনলেন—'সাবধান।' তারপর কে যেন ধাক্কা দিয়ে তাঁকে সরিয়ে দিল। কালভে বেঁচে গেলেন, কেননা তিনি যেখানে পা বাড়াতে যাচ্ছিলেন সেখানে প্রাচীর ফেটে হাঁ হয়ে আছে, সেই গর্তে পা পড়লেই খাদে আছড়ে পড়তে হত।

কেবল শারীরিক মৃত্যু থেকে নয়, আত্মিক মৃত্যু থেকেও স্বামীজী কতবার তাঁকে রক্ষা করেছেন। সুখে বা শোকে যখনই প্রাণসত্য ভুলেছেন, তখনই আবির্ভূত হয়েছেন তিনি। মার্সেই শহরের পথে সুখের তরঙ্গে গা ভাসিয়ে কালভে হাঁটছেন—কে যেন এগিয়ে এল ভিড় ঠেলে তাঁর দিকে—চলে গেল পাশ দিয়ে চাপা স্বরে এই কথা বলে—'ভুলো না, মন্ত্র ভুলো না।'

স্বামীজী কয়েকটি মন্ত্র দিয়েছিলেন তাঁকে। সেগুলি স্বামীজীর স্বরেই তিনি তাঁর ছাত্রীদের শিখিয়েছিলেন। সেই মন্ত্র কালভের বুকের ভিতরে জ্বলত, আর শিখায়িত হত কণ্ঠে। তিরিশের দশকের শেষের দিকে

কালভে প্যারিসে তাঁর এক বান্ধবীর ঘরে বসে আছেন, মাদাম ভার্দিয়েও আছেন, তাঁর সঙ্গে স্বামীজীর কথাই হচ্ছে, ভার্দিয়ে কালভেকে গান গাইতে অনুরোধ করলেন।

"তখন প্রায় ৬টা বাজে, অপরাহ্ণ শেষ, আগত সন্ধ্যা। কালভে বললেন, ঠিক আছে, গাইব—যেভাবে মন্ত্রটি গাইতাম সেইভাবেই গাইব।

"কালভে একেবারে শান্ত গভীর গম্ভীর হয়ে গেলেন। চোখ বুজলেন। তারপর গাইতে শুরু করলেন ঐশ্বর্যময় পূর্ণ প্রগাঢ় পরম শক্তিশালী কণ্ঠে: ওম্! ওম্! হরি তৎ সৎ!

"সমস্ত ঘরটি থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল, প্রচণ্ড স্পন্দনে শিহরিত হয়ে যেন ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হল।

"আর কালভে একেবারে মূর্তির মতো, সঘন শ্রদ্ধায় পূর্ণ, যে-পবিত্র কাজ করছেন তারই মহান ভাবে সমাচ্ছন্ন। অপূর্ব তা।"

কালভে আরও একটি মন্ত্র ডায়েরিতে বারবার লিখে রেখেছেন, যার কথা জানি আমরা—'অসতো মা সদ্‌গময় ··'

Lead us from the unreal to the Real,

From darkness to light,

From death to immortality

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

O Rudra, may your face which is gracious protect me forever.

স্বামীজীর দেওয়া সুরে কালভের ছাত্রছাত্রীরা যখন ঐ মন্ত্রগুলি গাইত—ভারতের অরণ্যভূমে, নদীতটে, গুহা-গহ্বরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত সেই সুপ্রাচীন বেদমন্ত্র যখন একালে অপরিচিত পরিবেশে অভাবিত কণ্ঠে উৎসারিত হত—তখন কালভের মনে পড়ত স্বামীজীর কথাগুলি—

'জর্ডনের জল গঙ্গাতে মিলতেই পারে। তাদের উৎস তো একই।

'খ্রীস্টকে ভালোবাসো। তিনি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। খ্রীস্টকে অনুসরণ করো'—স্বামীজী বলেছিলেন।

আরও বলেছিলেন—'সাহস, সাহস, চাই। সাহস ছাড়া জীবন নেই।'

সাহস কি আমার নেই? কালভে নিজেকে প্রশ্ন করেন। তাহলে জীবনের এতখানি পথ হাঁটলুম কি করে? ৭৬ বৎসর বয়সে রুটির জন্য আমার সাধের প্রাসাদ বেচে দিয়ে বেঁচে আছি কি করে? এখনো তো লড়ছি—লড়াই করেই চলেছি।

হঠাৎ অবুঝ অভিমানে কালভের মন ভরে যায়।—স্বামীজী! আমার এই ভগ্ন শ্রান্ত জীবনে আর তো তোমাকে পাচ্ছি না। আমার জন্য তুমি কিছু করছ না কেন? তোমার শক্তিতে বাঁচাও, আবার জাগাও আমাকে।

১৯৩৮। কালভের বয়স আশি। মৃত্যুর পদধ্বনি শুনছেন। কী এসে যায়। যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ চলব। আবার যাবো আমেরিকায়, সফর করব, দেখাবো—আমার জীর্ণ দেহের পোড়া অঙ্গারের মধ্যে ঢাকা আছে নির্ধূম অগ্নি। কালভে উৎফুল্ল—তাঁকে নিয়ে ফিল্ম তৈরি করা হবে আমেরিকায়—তার তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি সেখানে যাবেন। সেই কল্পনায় জরার আবর্জনা সরিয়ে চির তারুণ্য কালভের দেহকে ঘিরে নৃত্য করে। সবিস্ময়ে কালভের বান্ধবী সে দিকে তাকিয়ে থাকেন।

যাওয়া হল না।

যুদ্ধ বাধল। কামানের গোলায়, বোমার ধাক্কার ধুলো হয়ে উড়তে লাগল মানবসভ্যতা। ফরাসির চিরশত্রু জার্মানরা কালভের মাতৃভূমি অধিকার করে নিল। রুথেনিয়ান উপজাতির চির স্বাধীন রক্তের কন্যা

কালভে দাসত্বের শিকল গলায় ঝুলিয়ে পড়ে রইলেন। এখন তিনি কী করতে পারেন? অশীতিউত্তীর্ণা মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধা—আর কি প্রেরণাকে কণ্ঠে নিয়ে ডাক দিতে পারবেন ফরাসি বীর্যকে, পুরনো দিনের মতো?—

ফ্রান্সের সন্তান! হাতিয়ার, তোলো হাতিয়ার!
বীর তুমি মহাবীর! তোলো হাতিয়ার।

মুক্তি চাই। এবার মুক্তি চাই এই জীর্ণ দেহের বন্ধন থেকে। কালভে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসেন। পুরনো খাতাটা টেনে নেন। ধীরে তার পাতা ওল্টাতে থাকেন। প্রতি পাতায় বিখ্যাত ব্যক্তিদের চিঠি বা প্রশংসাপত্র আঠা দিয়ে জোড়া আছে। শেষে যেটি খুঁজছিলেন সেই পাতাটি পেয়ে যান, ঝুঁকে পড়েন, পড়তে-পড়তে অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে যায়, দৃষ্টি সুদূর উদাস হয়ে হারিয়ে যায় কোথায়। কালভে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন কতক্ষণ।

কালভে স্বামীজীর চিঠি পড়ছিলেন। কালভের পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি ওটি লিখেছিলেন, ১৫ মে, ১৯০২। তার পরে স্বামীজী দু'মাসও এই পৃথিবীতে থাকেন নি। কালভে বিষণ্ণ হাসি হাসলেন।—আমার পিতার মৃত্যুতে স্বামীজী সান্ত্বনা দিয়ে এই চিঠি লিখেছিলেন, কে জানে তিনি অধিকন্তু সান্ত্বনা দিয়েছিলেন কি-না তাঁর নিজের আসন্ন বিদায়ের শোক মোছাতে! স্বামীজী তো নিজের মৃত্যুর কাল জানতেন! এ চিঠি তাঁর বিদায় বাণী।

স্বামীজী লিখেছিলেন:

গভীর দুঃখের সঙ্গে তোমার শোকের কথা শুনলাম।
এই সব আঘাত আমাদের সকলের উপরে আসতে বাধ্য।
এই হল জগতের নিয়ম। তবু এদের সহ্য করা কত কঠিন!

জীবনের নানা সঙ্গ আর অনুষঙ্গ এই অবাস্তব জগতকে আমাদের কাছে বাস্তব করে তোলে। সঙ্গের আয়ু যত দীর্ঘ হয় ততই ছায়াকে অধিকতর বাস্তব মনে হয়। কিন্তু অনিবার্য সেই দিন যখন অনিত্য চলে যায় অনিত্যে। কিন্তু হায়, কী অসহ্য সেই শোক।

তথাপি নিত্য যা, আত্মা, তা নিত্যই আমাতে বর্তমান, তা সর্বত্র বিরাজিত। সেই ধন্য, যে এই পলাতক ছায়ার জগতে নিত্যকে দর্শন করতে পেরেছে।

স্বামীজী বলেছিলেন, কালভের মনে পড়ে, জন্মের দ্বার খুলে-খুলে মানুষ এগিয়ে চলে চিরমৃত্যুর দিকে, যার নাম নির্বাণ—মুক্তি। সে মুক্তি কখন, কত জন্মে আসবে, কেউ বলতে পারে না। মুক্তিবাসনা প্রচণ্ড হলে দ্রুত আসবে তা ; যদি না হয়, তাহলে বহু জন্মের প্রাকার পেরোতে হবে। কত দ্রুত চলতে চাও, সে তোমারই উপর নির্ভর করে। পথ ক্ষুরধারার ন্যায় নিশিত ও দুর্গম। সে পথে চলতে সাহস চাই।

স্বামীজী বলেছিলেন, কালভে মনে মনে আবার উচ্চারণ করেন ঃ

'Go ahead with courage. For Life is courage.'

সাহস কালভের আছে। তবু ভরসা যেন হয় না। তখন মনে পড়ে স্বামীজীর আর একটি কথা ঃ জ্ঞানের পথ দুর্গম মনে হলে ভক্তির পথ নিও। প্রার্থনা করো ঈশ্বর আর তাঁর পুত্রদের কাছে। প্রার্থনা ঐকান্তিক হলে দর্শন পাবে। যদি কোনো জ্যোতির তনয়ের দর্শন পাও, তোমার জীবন পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তখন তুমিই হয়ে যাবে আলোককন্যা।

কালভে ভাবেন, আমার জীবনে তো দুই ধারাই মিলেছে—জ্ঞানের শক্তি ও সাহস এবং ভক্তির প্রার্থনা। আর···আমি তো পেয়েছি ঈশ্বর-পুত্রের সাক্ষাৎ দর্শন। কালভে ভাবেন—চলতে চলতে আমার মুক্তি।

১৯৪২, ৬ জানুয়ারি। দক্ষিণ ফ্রান্সের মিলাউ-এ কালভে আছেন। বয়স ৮৩। অন্তিম ক্ষণ ঘনিয়েছে। তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়েছে—হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। হাসপাতালে পৌঁছবার আগে পথেই শেষ নিঃশ্বাস পড়ল।

কালভে পথে পড়লেন। তবু চললেন।

